ব্রহ্মচর্য্য

পরিব্রাজক

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মচক্র

বেলুড়

প্রকাশিকা
সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতী
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
২১১ এ, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
পোঃ—বেলুড়মঠ, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম প্রকাশ—১৩৬০—১১০০

কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান :

১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—৭০০০১২

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

নিবেদন

করাচিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষরূপে আমি মান্দ্রাজের বেদান্তকেশরী মাসিকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধ উক্ত বৎসর করাচির 'ডেলি গেজেট' নামক ইংরাজী দৈনিকে পুনরায় প্রকাশিত হয়। এই দুই প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রবন্ধটি পড়িয়া মান্দ্রাজ ও সিন্ধু প্রদেশের বহু পাঠক-পাঠিকা আমাকে পত্র দ্বারা উহাকে পরিবর্ধিত আকারে পুস্তিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানান। উল্লিখিত বন্ধু-বান্ধবীদের উৎসাহজনক অনুরোধ পরিপূরণার্থ ১৯৪১ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে একটি ইংরাজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর-কৃপায় উক্ত পুস্তিকা এক বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে উহা ভারতে ও বিদেশে প্রচারিত হয় এবং পাঠকবৃন্দ ও বিভিন্ন পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কোন পাঠক লিখিয়াছিলেন, "এই পুস্তিকা প্রত্যেক গৃহে ও প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষণযোগ্য। পৃথিবীর স্কুল-কলেজের লাইব্রেরীগুলিতে এই বইটি রাখা আরও প্রয়োজন।" ইহা অতিশয় তৃপ্তিপ্রদ যে, পুস্তিকাটি অন্তত কয়েকজন পাঠক-পাঠিকার কাছে ভাল লাগিয়াছে।

উহার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ খ্রীঃ জুলাই মাসে বোম্বাইএর থ্যাকার এ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক। "ক্যালকাটা রিভিউ" নামক বিখ্যাত ইংরাজী মাসিকে উহার যে পরিচয় প্রকাশিত হয়, উহার একাংশে আছে, "সন্ন্যাসী গ্রন্থকার এই পুস্তকে ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন হিন্দুশাস্ত্রে এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞগণের বাক্যোদ্ধারপূর্বক শরীর-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের আলোকে।

তরুণ পাঠক-পাঠিকাদিগকে ইহা অব্রহ্মচর্য্যের অনিষ্ট সম্বন্ধে সতর্ক করিবে এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভে অশেষ সহায়ক হইবে। ছাত্রছাত্রীগণ ব্যাপকভাবে এই পুস্তিকা যতই পড়িবে, ততই স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হইবে এবং দেশেরও কল্যাণ হইবে।" আন্তরিক আগ্রহ সত্ত্বেও পূর্ণ এক দশক পরে ইহার বাংলা সংস্করণ প্রণয়ন ও প্রকাশন সম্ভব হইল।

ইংরাজী মনীষী জে. এস. মিল সত্যই বলিয়াছেন, "সমাজ যে সকল অনিষ্ট হইতে কষ্টভোগ করিতেছে, সেইগুলি মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করিলে অপসারণের সম্ভাবনা।" স্বামী বিবেকানন্দ ও মাহাত্মা গান্ধী প্রমুখ অমর সংস্কারকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি বর্তমান অবনতির মূল কারণ নির্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছি। বিভিন্ন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের মন্তব্য উদ্ধৃতি সহায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্রহ্মচর্য্য পালনই আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের মূল ভিত্তি এবং ইহা ব্যতীত সকল উন্নতির আশা কল্পনাপ্রসূত ও সুদূর পরাহত। অব্রহ্মচর্য্যই জটিলতম যুগ-সমস্যা বা জীবন-সমস্যা। রাষ্ট্র-পুঞ্জ এই সমস্যা সমাধানে যতই যত্নশীল হইবেন, ততই বিশ্বশান্তি সমীপবর্ত্তী হইবে, অন্যথা চিরকাল ইহা দূরবর্ত্তীই থাকিবে।

উক্ত আদর্শ উপস্থাপনে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাগণের বিচার্য্য। তবে যদি এই পুস্তক তরুণ-তরুণীদিগকে দৈনন্দিন জীবনে বীর্য্যধারণের প্রয়োজনীয়তা হৃদ্গত করিতে সহায়ক হয়, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।

যে সকল পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি, তন্মধ্যে অনেকগুলির নাম যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপযোগী অনেক নিয়ম ও নির্দেশ উল্লেখ করিয়াছি। সুদৃঢ় সংকল্প লইয়া বীর্য্যধারণে অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ হয়। ইহা মহাত্মা গান্ধীর অপূর্ব জীবনে বর্ত্তমান জগৎ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে। তিন মাস আন্তরিক প্রচেষ্টা করিলে ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা

আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করিতে পারিব। এই বিষয়ে বাংলায় বহু গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান পুস্তক রচনার প্রয়োজন এই যে, বিষয়টি ইহাতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত এবং কালোপযোগী করিয়া লিখিত। এই পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশনে আমার প্রধান সহযোগী ছিলেন কয়েকটি শিক্ষিত তরুণ। তন্মধ্যে একজন অধিকাংশ পুস্তকের প্রথম প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। তাহাদের অক্লান্ত ও অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতীত আমার পক্ষে বর্তমান জরা-বার্ধক্যে এই পুস্তক-রচনা ও মুদ্রণ সম্ভব হইত না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
রথযাত্রা, আষাঢ়, ১৩৫৯

গ্রন্থকার ও গ্রন্থমর্ম

পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের সহিত আমাদের পরিচয় বহু বৎসরের। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার বহুমুখী কর্মজীবনের কয়েকটি বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবার সৌভাগ্য আমরা লাভ করিয়াছি। সেই হেতু আমরা 'প্রাংশুলভ্য ফললোভে উদ্বাহু বামনবৎ' হইলেও সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদানে ও বর্তমান গ্রন্থের মর্মবিশ্লেষণে সাহসী হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে যাহা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহা এক কথায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়, আলোচ্য গ্রন্থটির যাহা সারমর্ম তাহাই সন্ন্যাসী গ্রন্থকারের জীবন-ধর্ম। এই মন্তব্য যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নয় তাহা তাঁহারাই সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবেন, যাঁহারা তাঁহার জীবন-চর্যার সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িত আছেন। পুস্তকের ক্ষুদ্র কলেবরে দেশের উদীয়মান তরুণ সমাজের সম্মুখে যাহা ধরা হইয়াছে, এবং যে বাণী, উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা লেখকের জীবন-বর্তিকা হইতে বিশিষ্ট নিষ্প্রাণ মৃতশিখা নয়। উহা তাঁহার স্বাভাবিক জীবন-বাণী। সেজন্য ব্রহ্মচর্য্য আদর্শের আলোচনা এই গ্রন্থে মামুলি কথার কথা হইয়া দাঁড়ায় নাই, লেখকের জীবনে উহা ভাস্বর সত্য-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের দিব্য স্পর্শে আসিয়া গ্রন্থকার ছাত্র জীবনেই গৃহত্যাগপূর্বক বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তখন হইতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সঞ্জীবনী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি সনাতন হিন্দু ধর্মের পুণ্য মন্দাকিনীকে শিরোব্রত করেন। তপস্বী শিবানন্দের পূত পদাশ্রয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহন করিয়া তিনি তাঁহারই

নিকট ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত হন। তদবধি হিন্দুধর্মের সাধন রক্ষণ ও প্রচারকে তিনি তাঁহার যতি-জীবনের দিব্য দায়রূপে গ্রহণ করেন। এই গুরুদায়িত্বের পবিত্র হোমকুণ্ডে তাঁহার ত্যাগোদ্দীপ্ত চির কুমার জীবন উৎসর্গীকৃত। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ধ্যানের ভারতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "ত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ। এই দুই প্রণালীতেই আমাদের সমস্ত কর্মধারাকে চালিত করিতে হইবে।" পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের জীবন উক্ত ত্যাগ ও সেবার বেদীমূলে নিবেদিত। আসমুদ্র হিমাচল ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ ব্যাপক পরিভ্রমণপূর্বক তিনি দীর্ঘকাল তীর্থাদি দর্শন এবং হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অক্লান্ত প্রচারে ব্যাপৃত, থাকেন।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ বাংলার অন্যতম প্রবীণ ও পণ্ডিত সন্ন্যাসী। ১৯২৫-১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ধর্মপ্রচারে ও সেবাকার্যে ব্রতী ছিলেন। বরিশাল, দেওঘর, দিল্লী, মহীশূর, কাশী ,রেঙ্গুন, কলম্বো, লাহোর ও করাচি প্রভৃতি স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের যে সকল আশ্রম আছে, সেইগুলিতে তিনি অতন্দ্র সাধকরূপে কার্য করেন। তিনি ১৯৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত করাচীতে (পাকিস্থানে) অধুনালুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। সিন্ধুদেশে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীগণ সংস্কৃত শিক্ষার কোন সুযোগ পাইত না এবং বাধ্য হইয়া আরবী ও ফারসী পড়িত। ইহা দেখিয়া তিনি সমগ্র সিন্ধুদেশের হাইস্কুলসমূহে সিন্ধী হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হন এবং আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেন। তখন সিন্ধীভাষা কিরূপে আরবী ও ফার্সী প্রভাবে বিকৃত হইতেছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি ১৯৪২ খ্রী:' মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষরূপে তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ম্যাজিক-লণ্ঠন সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী প্রচার করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে করাচী আশ্রমের অধ্যক্ষতা

হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক তিনি মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কাথিয়াবাড়, রাজস্থান, সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর এবং উত্তরপ্রদেশে মহেঞ্জোদারো এবং পাঞ্জাবে হরপ্পা ও তক্ষশীলাদি প্রাগৈতিহাসিক স্থান পরিদর্শনান্তে যে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেন, সেইগুলি তৎপ্রণীত "আমার ভ্রমণ" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। পুষ্কর তীর্থে কিছুকাল তপস্যা করিয়া তিনি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আজমীর শহরে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত আশ্রম অধুনা নিজস্ব ভূমিতে ও স্থায়ী গৃহে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই সমগ্র রাজস্থানে প্রথম রামকৃষ্ণ আশ্রম। কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থান কালে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৩ সালের জুন পর্যন্ত তিনি যে আটটি বেতার বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেইগুলি স্থানীয় বৌদ্ধ, ইংরাজ, খৃষ্টান ও মুসলমান শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক সাগ্রহে শ্রুত হয়। রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির অধ্যক্ষরূপে উক্ত শহরে তিনি তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী উক্ত বৌদ্ধ দেশে বিস্তৃত ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের যে ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে বোঝা যায়, তাহার ঐতিহাসিক দৃষ্টি-দীপ কিরূপ সমুজ্জ্বল। তিনি আমাদিগকে বলিতেন, 'দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইতিহাস পড়িবে এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দর্শন পড়িবে।" প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ 'মডার্ণ রিভীউ,' 'প্রবুদ্ধ ভারত', এরিয়ান পাথ 'বেদান্ত কেশরী' ও 'ইণ্ডিয়ান রিভীউ,' এবং 'প্রবর্তক.' 'উদ্বোধন,' 'বসুমতী,' 'প্রবাসী,' 'বিশ্ববাণী,' 'উত্তরা,' ও 'ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরাজী ও বাংলা মাসিকে তাঁহার সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী ও সুচিন্তিত সমালোচনা-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার কয়েকটি মাসিক পত্রেও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। করাচীর 'সিন্ধু অবজার্ভার,' মাদ্রাজের 'হিন্দু,' ব্রহ্মদেশের 'রেঙ্গুন টাইমস,' বোম্বাইয়ের 'বম্বে ক্রনিকল,' কলম্বোর 'সিলোন অবজার্ভার,' দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস,' এবং কলিকাতার

'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড' প্রভৃতি ইংরাজী দৈনিকে তাঁহার সুলিখিত রচনাবলী প্রকাশিত হইত। বাংলায় ও ইংরাজিতে তাঁহার ৭০।৭৫ খানি পুস্তক আছে। ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসা, যোগ, ইতিহাস, জীবনী নাটক, বেদান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থাবলী বিরচিত। তদনূদিত গীতা ও চণ্ডী এই পর্যন্ত দশটি সংস্করণে প্রায় আড়াই লক্ষ মুদ্রিত হইয়াছে। তদনূদিত 'গীতা' সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালিম্পঙ হইতে ১৩৪১ সালে ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে, লিখিয়াছিলেন, "উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। সংস্কৃত শাস্ত্রের এরূপ যত্নকৃত বিশুদ্ধ অনুবাদ আমি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই।"

ধর্মশিক্ষক ও প্রচারক রূপে কলিকাতায় এবং বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিরেও তিনি সুপরিচিত। বাংলা সাহিত্য সাধনায় তিনি যে স্মরণীয় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহার সামান্য আভাস পাওয়া যায়, ১৩৫৯ সালের অগ্রহায়ণ সাসে 'মাসিক বসুমতী'র 'সাহিত্য-সেবক-মঞ্জুষা' শীর্ষক প্রবন্ধে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রথমে ইংরাজীতেই গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের উপনিষদ সিরিজের অন্তর্ভুক্ত এবং অধুনা তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশিত। তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি ইংরাজী অনুবাদও করিয়াছেন। তৎপ্রণীত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ইংরাজী জীবনী মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক The Story of a Dedicated Life নামে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। উক্ত বর্ষে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের বয়স অর্ধশতক পূর্ণ হওয়ায় উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উক্ত জীবণী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পুস্তকরূপে রচিত। ১৯৪৪ খ্রী: যখন গিরিশ ঘোষের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় তখন তিনি গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও নাটক সম্বন্ধে যে ইংরাজী পুস্তক লেখেন তাহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকার অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। সেইগুলি রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম

কর্তৃক Hinduism Outside India নামক পুস্তকরূপে প্রকাশিত। ইংরাজীতে তাঁহার আরও কয়েকখানি অমূল্য পুস্তিকাও আছে। তিনি কলম্বো এসিয়াটিক সোসাইটি এবং প্রেগ ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউটের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৩৫৯ সালে ১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫২) মঙ্গলবার তিনি বেলুড় মঠ পরিত্যাগপূর্বক বেলুড়ে লালবাবা আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। উক্ত আশ্রমের তিনতলায় একটি গবাক্ষহীন টীন ছাদের ঘরে তিন বৎসর তিনি বাস করিয়াছেন। তথায় আহার ও আবাসের অসহ্য অসুবিধা সত্ত্বেও তিন বৎসরের মধ্যে তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত' 'দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ব্রহ্মচর্য্য,' 'বুদ্ধের কথা ও গল্প' ও ,উপনিষৎ' এই পাচ খানি বই লিখিয়াছেন এবং নানা স্থানে ১৭৫ দিন ধর্মপ্রসঙ্গ বা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত বর্ষের অগ্রহায়ণ মাসে চন্দননগর প্রবর্তক সংঘে যাইয়া তিনি ২৩শে মঙ্গলবার হইতে ২৬শে শুক্রবার পর্যন্ত চারদিন যথাক্রমে মীরাবাঈ, সন্তদাদু, রাসতত্ত্ব ও চণ্ডীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তথায় তাঁহার কথকতা শ্রবনার্থ প্রত্যহ প্রায় সহস্র শ্রোতার সমাগম হইত। প্রবর্তক সংঘের সাপ্তাহিক মুখপাত্র নবসংঘ ১৩৫৯ সালের ৭ই পৌষ উক্ত কথকতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "স্বামিজীর কথকতা অতি অপূর্ব হইয়াছিল। তাঁহার ভাষা অতি সরল, কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। তাঁহার সুমধুর ভজনগান ও মাতৃসঙ্গীত সহস্র সহস্র নর-নারীর চিত্ত মুগ্ধ করে। সকলেই ভক্তিনম্র হৃদয়ে তাঁহার কথকতা শ্রবণ করেন।" কথকতার শেষ দিন প্রবর্তক সংঘের সম্পাদক তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া বলেন, "স্বামিজী শুধুই যে একজন জ্ঞানী পুরুষ, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহাই নহেন, তিনি একজন যথার্থ সাধক, সুগায়ক এবং অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শ্রুতিধর প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ।" এইরূপে তিনি কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বালিগঞ্জ মিলন মেলা, বহুবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ বোধচক্র, শ্রীরামপুর সাহিত্য সমিতি, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি, নারিকেলডাঙ্গা গুরুদাস ইনষ্টিটিউট, পার্শীবাগান রামকৃষ্ণ সমিতি,

ঘাটাল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বালি হরিসভা, লিলুয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ভদ্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, কোলাঘাট রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রভৃতি৫০।৬০টি প্রতিষ্ঠানে বহুবার ধর্মীয় ভাষণ দিয়াছেন। গ্রন্থকার কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছেন, "যুগাচার্য বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয়ের পরেই হিন্দুসন্ন্যাসীর পরিব্রজ্যার ক্ষেত্র বৃহত্তর হইয়াছে। ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণরা সমগ্র প্রাচ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এখন বেদান্তী সন্ন্যাসীরা পাশ্চাত্যেও পর্যটন এবং ধর্মপ্রচার করিবেন। কলম্বোতে অবস্থান কালে তিনি জাপান প্রবাসী বিদ্রোহী-বীর রাস বিহারী বসুর সহিত পত্রালাপ করিয়া জাপানে যাইবার ব্যবস্থা করেন এবং রেঙ্গুনে থাকিবার সময় তিনি চীন ও জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে ভ্রমনার্থ পাশ-পোর্টও সংগ্রহ করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার ধর্ম-প্রচারের ফলে নানা স্থানে ধর্ম প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সক্রেটিশ* বলিতেন, আমি চলমান প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থকারকে চলমান প্রতিষ্ঠান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যবৃন্দের জীবন-চরিতাবলী একত্রে তিনি ১৩৫৬ সালের কার্তিক মাসে বেলুড় মঠে অবস্থান কালেই 'নবযুগের মহাপুরুষ' নামক পুস্তকের দুই খণ্ডে সহস্র পৃষ্ঠায় সর্ব প্রথম প্রকাশ করেন। যৌগিক ব্যায়াম সম্বন্ধে তাহার পুস্তকও বাংলা ভাষায় প্রথম। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে করাচী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষরূপে তিনি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ করাচীর 'ডেলি গেজেট' নামক ইংরাজী দৈনিকে এবং মাদ্রাজের 'বেদান্ত কেশরী' নামক ইংরাজী মাসিকে প্রকাশ করেন, তাহা বোম্বাইয়ে থ্যাকার অ্যাণ্ড কোম্পানী কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন বা বীর্য্য-ধারণই স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভের মূল উৎস। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ ব্রহ্মচর্য্যের সৃজনীশক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা যথাস্থানে উল্লেখ পূর্বক গ্রন্থকার ব্রহ্মচর্য্য পালনের আবশ্যকতা প্রদর্শন

---

*গ্রীস দেশের মহা মনীষী

করিয়াছেন। বীর্য্যধারণই পূর্ণ স্বাস্থ্য ও অদ্ভুত শক্তি লাভের উৎকৃষ্ট উপায়—ইহাই উক্ত গ্রন্থের সারমর্ম।

এই গ্রন্থে ব্রহ্মচর্যের আলোচনা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রদত্ত। শরীর-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের আলোকে ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন তরুণ মনের কাছে অবশ্যই আদরণীয় হইবে। প্রাচীন গ্রীসের ঋষি সক্রেটিশের বাক্যোদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার সরলভাবে দেখাইয়াছেন, বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের স্থান কত উচ্চে। মার্টিন লুথার প্রভৃতি যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধী, গ্রন্থকার তাহাদের বাক্য নির্ভয়ে উদ্ধার করিয়া আপটন সিনক্লেয়ার, আলডাশ হাক্সলী ও ডেভিড থোরো প্রভৃতি মনীষীদের অকাট্য যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে সকল সারগর্ভ উক্তি আছে সেইগুলিও তিনি পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে ধরিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকতা ও শাস্ত্রীয়তা সহায়ে ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা প্রদর্শন গ্রন্থটির অসামান্য বিশেষত্ব।

কোন চিন্তাশীল লেখক বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি জীবনহীন মৃতের দেশে একটি অমৃত জীবন লইয়া আসিয়াছিলেন। মন্তব্যটি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। উনচল্লিশ বৎসরের অল্প আয়ুষ্কালে স্বামীজীর দেহ-মনে যে মহাস্বাস্থ্য ও মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই অলৌকিক। এখন প্রশ্ন এই, সেই অলৌকিক স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎস কোথায়? এই প্রশ্নের আধ্যাত্মিক সমাধান এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। ইহার প্রকৃত মীমাংসা আমাদের বিষয়ীভূত। স্বামিজী নিজেই স্বশিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে উক্ত প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন, কায়মনোবাক্যে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন ইহার প্রধান কারণ। ব্রহ্মচারী বিবেকানন্দই বাঙালী তরুণের অনুসরণীয় আদর্শ।

ব্রহ্মচর্য্যই মনুষ্যত্বের মৌল ভিত্তি। মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ তখনই ঘটে, যখন ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ জীবনে গৃহীত, পালিত ও সংসিদ্ধ হয়। বৈদিক যুগের হিন্দু সমাজ এই আদর্শকে সর্বোচ্চ আসন দিয়াছিল। বৈদিক মানবের গঠনমূলক

জীবনাধ্যায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই আরম্ভ হইত। সমগ্র হিন্দুজাতির জীবনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। সেই যুগে প্রত্যেক মানুষের জীবন-ঊষায় ব্রহ্মচর্যের বোধনমন্ত্র উচ্চারিত হইত। চতুরাশ্রমে বিভক্ত হিন্দুজীবন ব্রহ্মচর্য্য-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই বেদ-মার্গ ইহাই আর্য্য পথ।

নৈতিকতা ধর্মজীবনের ও সভ্য সমাজের প্রথম সোপান এবং উহা ব্রহ্মচর্য ব্যতীত অসম্ভব। এই সত্য অনাদৃত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী অনৈতিক পরিস্থিতি প্রাদুর্ভূত এবং অধিকাংশ মানব জীবন প্রায় পশুত্বের স্তরে অবনত হইয়াছে। ধর্মক্ষেত্র ভারতভূমিও এই সর্বনাশক প্রভাব হইতে রক্ষা পায় নাই। ভারতবর্ষে নৈতিক জীবন-মান সমুন্নত ছিল বলিয়াই এক সময় ব্যাস, বাল্মীকি, বুদ্ধ, শংকর, পতঞ্জলি, চৈতন্য, সায়ন, বাচস্পতি প্রভৃতি ঋষি-মুনি ও ধর্মগুরুগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বর্তমান যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, রমণ মহর্ষি, স্বামী রামতীর্থ, পওহারী বাবা, নাগ মহাশয় ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষদের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।

বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগে নীতিধর্ম যেরূপ সকল শিক্ষালয়ে ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানে আচরিত হইত, সেইরূপ যদি বর্তমান ভারতের গৃহে গৃহে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়, প্রতি শিক্ষালয়ে ছাত্রছাত্রীরা ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে দীক্ষিত হয় তবেই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ভবিষ্যতে অতীত অপেক্ষা অধিকতর গৌরব ও উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে।

বীর্যধারণই ব্রহ্মচর্য। আমরা যে খাদ্য আহার করি তাহা হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র বা বীর্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং বীর্যই শরীরের নিষ্কর্ষ বা সারতম ধাতু। এই বীর্যের ক্ষয় হইলে শরীর ব্যাধি-মন্দিরে পরিণত হয়। কায়মনোবাক্যে শুক্র ধাতুর সংরক্ষণই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য পালন। প্রমত্ত ইন্দ্রিয় নিচয় মনকে ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত করিয়া পরিশেষে মানুষকে ক্লীব ও পুরুষার্থের অযোগ্য করে। বীর্যহীনতা বা অব্রহ্মচর্যই আমাদের জাতীয় দুর্গতির প্রকৃত

কারণ। সে জন্য ব্রহ্মচারীর লক্ষ্য ইন্দ্রিয়জয়, বীর্য্যধারণ। উহাই উত্তম স্বাস্থ্য ও অনন্ত শক্তির উৎস। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য কায়িক ও মানসিক দুইই। ইহা বিধিমূলক (positive), কিন্তু নিষেধমূলক (negative) নয়। নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন দ্বারা ইহা স্বভাবসিদ্ধ করা যায়। আমাদের বর্তমান ঘনীভূত দুর্যোগে ও নির্বীর্য জাতীয় জীবনে ব্রহ্মচর্য্যই সেই আলো, যাহা ব্রতীর জীবনকে উদ্ভাসিত ও মহিমাময় করিবে।

নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানকল্পে শ্রদ্ধেয় স্বামিজী ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, দেবীমাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তত্ত্বানুসন্ধান, স্বারাজ্যসিদ্ধি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সংকলন ও প্রকাশ করিয়াছেন।

হিন্দু শাস্ত্রে মানবদেহ দেবমন্দির রূপে কীর্তিত। অতএব এই মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা অবশ্যই কর্তব্য। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারাই উহা সম্ভব। স্মরণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জনই ব্রহ্মচর্য্য। এই পুস্তকে স্বামিজী তাহাই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেশের পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা এই গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। অলমিতি।

ব্রহ্মচর্য্য প্রশস্তি

বীর্যধারণে ধৃতি ও স্মৃতিশক্তি বহুগুণে বাড়ে। কাম রিপুর উপর পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তারে চেষ্টিত হও। বার বৎসর বীর্যধারণে সমর্থ হইলে মেধা নাড়ী জন্মে। কাম শক্তি যতই ওজঃ শক্তিতে পরিণত হয় ততই মেধানাড়ী পুষ্ট হয়। মেধানাড়ীর সাহায্যে ভগবা'ন লাভ হয়। —শ্রীরামকৃষ্ণ

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ হয়। দেহ ও মনের অমিত শক্তিই বীর্য্য। —ঋষি পতঞ্জলি

যাহারা বিশ্বাস করে, সুখ দেহজাত এবং যাহা ইন্দ্রিয়-সুখ বাধিত করে তাহাই দুঃখ, কিরূপে তাহারা কামে অভিভূত হয় ও দুঃখ ভোগে?

—ফরাসী মনীষী প্যাস্কাল

ফরাসী মনীষী মিচিলেট বলেন, 'যদি শক্তি চাও তবে শুদ্ধ থাক। যারা জড়বুদ্ধি তারাই ব্রহ্মচর্য্যকে উপহাস করে। —মঁসিয় জাষ্টিন গডার্ড

যে সকল দেশ ইন্দ্রিয়-সংযম সাধনে অগ্রসর তাহাদের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

—টমাস ম্যান

সম্যক্ বীর্যধারণ বুদ্ধত্বলাভের সুকৌশল। —ভগবান্ বুদ্ধ

সকল প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় অসংযম ও অব্রহ্মচর্য্য।

—স্বামী শিবানন্দ, বেলুড় মঠ

সর্বদা সর্বত্র কায়ে, মনে ও বাক্যে বিশুদ্ধ থাকাই ব্রহ্মচর্য্য। শুদ্ধ মনে অদ্ভুত উদ্যম ও অসীম ইচ্ছাশক্তি জন্মে। বীর্যধারণ দ্বারা যে অলৌকিক শক্তিলাভ হয় তৎসাহায্যে মানব মনের উপর, এমন কি, পশু প্রভৃতির উপর প্রভুত্ব করা যায়। জগতের ধর্মগুরুগণ সম্যক ব্রহ্মচারী ছিলেন বলিয়া এত শক্তিশালী হইয়াছিলেন

যিনি দ্বাদশ বৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করিবেন তিনি নিশ্চয়ই বহু অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইবেন। যদি মহৎ হইতে চাও তবে বীর্যধারণে যত্নশীল হও। ধর্মগুরুর পক্ষে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য অত্যাবশ্যক। বৈদিক প্রজ্ঞার ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচারীর জীবন সুস্বচ্ছ স্ফটিকবৎ পবিত্র। কেবলমাত্র বীর্যধারণ দ্বারা সকল বিদ্যা অল্প সময়ে আয়ত্ব করা যায় এবং একবার যাহা শোনা বা জানা যায়, তাহা চিরকাল মনে থাকে। ব্রহ্মচর্যের অভাবে আমাদের যুগে প্রত্যেক সাধনাই ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা অসাধারণ আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তি লাভ হয়। আজীবন কৌমার্যও অন্যতম ধর্মসম্পদ্। —স্বামী বিবেকানন্দ

স্বেচ্ছাকৃত বীর্যধারণের ব্রতই দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য রক্ষার উত্তম সহায়। —ফোয়েরস্টার

বীর্যধারণে সমর্থ হইলে অণিমাদি শক্তি লাভ হয় এবং সেই সকল শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। —ব্যাসদেব

ব্রহ্মচর্য ব্যতীত উচ্চাদর্শ দৃঢভাবে অনুসরণ করাও অসম্ভব। শরীর মস্তিষ্ক ও মনের স্বাস্থ্য ও শক্তি বর্ধনে ব্রহ্মচর্য অত্যাবশ্যক। যাহারা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তাহাদের সূক্ষ্ম স্মৃতি ও অসামান্য বোধশক্তি লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য পালনের ফলে যে সূক্ষ্ম নাড়ী জন্মে তাহার দ্বারাই এই সকল বিভূতি লাভ হয়। আমাদের আচার্যগণ ব্রহ্মচর্য পালনে এত জোর দিয়াছেন কেন জান? ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা জানিতেন, যদি কেহ ইহা পালন করিতে অক্ষম হয় তাহার জীবন উৎসন্ন যায়। কঠোর ব্রহ্মচারী কখনো জীবনী শক্তি হারায় না। সে একজন পালোয়ান না হইতে পারে; কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক এত পরিপুষ্ট হয় যে, ইহা অতীন্দ্রিয় বিষয় অবরোধের অদ্ভুত সামর্থ্য লাভ করে। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য কয়েকটি নিয়ম পালন। উত্তেজক খাদ্য, অতিনিদ্রা, অতিশ্রম, আলস্য, কুসঙ্গ এবং অসৎ আলাপ ব্রহ্মচারী পরিহার করিবে। বীর্যধারণে দেহ ও মন সবল থাকে। বীর্যধারণ ব্যতীত মন কখনো ধ্যান-ধারনার শক্তি লাভ

করিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলেন, বার বৎসর বীর্যধারণ করিলে ঈশ্বরদর্শন সহজলভ্য হয়। —স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বেলুড় মঠ

প্রীতি সম্বন্ধে সক্রেটিশের উপদেশ ছিল এই যে, সুদর্শন নরনারীর সহিত ঘনিষ্ঠতা কঠোরভাবে বর্জন করিবে। কারণ তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, উল্লিখিত ব্যক্তিদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিলে বীর্যধারণ সম্ভব হয় না। তিনি বলিতেন, 'সম্ভবতঃ কামদেবকে এইজন্য পুষ্পধন্বা বলা হয় যে, সুন্দর ব্যক্তিরাই দূর হইতে অপরকে আহত বা আকৃষ্ট করে।' বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে তিনি এত সুসংযত ছিলেন যে, অন্য লোকে যেমন অনায়াসে কুৎসিত ও বিশ্রী ব্যক্তি হইতে সহজে পৃথক্ করিতে পারে তেমনি তিনি সর্বাপেক্ষা সুশ্রী ব্যক্তি ও সুন্দর বস্তু হইতে নিজেকে সুদূরে রাখিতেন। —গ্রীক দার্শনিক জেনোফোন

নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। ব্রহ্মচারী এত নিষ্কলুষ বিশুদ্ধিত সম্পন্ন হয় তাহাকে মানুষ না বলিয়া দেবতা বলাই উচিত। যিনি ধৃতরেতা এই জগতে তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। বীর্যস্তম্ভন দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিই ঠিক আমার মত হইতে পারে। —শঙ্করাচার্য

কাম রিপুর দ্বারা জীবন, শান্তি, শক্তি, আয়ু, স্মৃতি, সম্পদ্, সুনাম, সত্যনিষ্ঠা ও ভাবসংশুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট হয়। যে মৃত্যু পর্যন্ত কাম ও ক্রোধ হইতে উদ্ভূত বেগ সহ্য করিতে পারে সে-ই যোগী, সেই সুখী। —শ্রীকৃষ্ণ

আহারে সতর্কতা অবলম্বন করিলে ত্রিবর্গ লাভ হয়। কিন্তু কামবেগ ধারণ করিলে চতুর্বর্গ লাভ হয়। যদিও প্রথমে কামপ্রবৃত্তি তরঙ্গাকারে থাকে তাহারা কুসঙ্গের প্রভাবে সমুদ্রাকার ধারণ করে। —নারদ মুনি

শুক্রক্ষয়ে আয়ুক্ষয় হয়। কিন্তু বীর্যধারণে আয়ুবৃদ্ধি হয়। সুতরাং বীর্য-ধারণের জন্য সকলের সাধ্যমত যত্নশীল হওয়া উচিত। —শিবসংহিতা

জ্ঞানী বিবাহিত জীবন পরিহার করিবেন। কারণ ইহা তাঁহার পক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডতুল্য। সংস্পর্শ হইতে আসক্তি এবং আসক্তি হইতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সুতরাং ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেই পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। —ভগবান্ বুদ্ধ

যখন পশুরা, এমন কি সর্পরাও, মৈথুনরত হয় বা নরনারীরা কামাসক্ত হয় তখন তাহাদিগকে দেখাও পাপ। —শ্রীমদ্ভাগবত

মস্তিষ্ক বিশেষতঃ স্মৃতিশক্তির দৌর্বল্য চরিত্রহীনতা ও ব্রহ্মচর্যহীনতার নিশ্চিত লক্ষণ। —ডাঃ লুইস্

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 'হে রাজন্, ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে, যিনি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচারী, ইহজগতে এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার অপ্রাপ্য। একজন চতুর্বেদে পণ্ডিত এবং আর একজন কঠোর ব্রহ্মচারী। এই উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্যহীন শ্রোত্রিয় অপেক্ষা নিরক্ষর ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠতর।"

—মহাভারত

যুবক-যুবতীগণ বীর্য ধারণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। নচেৎ যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে যে শক্তি সঞ্চিত হইবে শুক্রপাতে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। বীর্য ধারণ ব্যতীত স্বাস্থ্যোন্নতি বা শরীর গঠন অসম্ভব। যতই ব্যায়াম কর বা যতই ভাল খাও না কেন, বীর্যধারণ না করিলে স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের আশা নাই। যৌগিক ব্যায়াম, পরিমিত আহার ও বীর্যধারণ—এই তিন উপায় অবলম্বন করিলে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ সুনিশ্চিত।

—সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম

———

পরিব্রাজক শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ব্রহ্মচর্য্য

—এক—

ভারতই ব্রহ্মচর্য্যের লীলাভূমি

পুরাকালে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মহাদেশ ভারতবর্ষই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের অনুশীলনে ব্যাপকভাবে ব্রতী হইয়াছিল। এই সুমহান্ আদর্শের অরুণোদয় কতিপয় বৈদিক ঋষির জীবনের মধ্য দিয়া জগতে সত্যালোক বিচ্ছুরণ করিয়াছিল। আমারা প্রশ্ন উপনিষদে এই ঘটনাটী পাই। একদা সুকেশ, ভারদ্বাজ প্রমুখ ছয়জন ঋষি ভগবান্ পিপ্পলাদের নিকট পরাবিদ্যা লাভার্থ গমন করেন। পিপ্পলাদ তাঁহাদিগকে আরও এক বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনে উপদেশ দেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, উক্ত কাল অতীত হইলে তাঁহারা তৎকর্তৃক ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত হইবেন। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ বিবৃত, তাহাতে আছে, ব্রহ্মা ইন্দ্রকে একশত এক বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য পালনান্তে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দেন। কৌষীতকী উপনিষদে ব্রহ্মচর্য্য-দীক্ষার কথা উল্লিখিত আছে। প্রাচীন ভারতে অন্যান্য অনেক বিদ্যা ত বটেই, এমন কি সর্বোচ্চ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের মূল সর্তই ছিল, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের সার্থক উদ্‌যাপন।

ভারত হইতে এই ব্রহ্মচর্যাদর্শ মিশরে নব্য প্লেটোবাদী এবং গ্রীসে পিথাগোরাস-পন্থী এবং পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য দেশে অল্প-বিস্তর

প্রসারিত হয়। আবার ভারত হইতেই উক্ত আদর্শ বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে এশিয়ার বহু দেশে প্রসার লাভ করে। পারস্যবাসিগণ এই মহান্ আদর্শ ভারতের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন। বৌদ্ধ প্রচারকগণ ব্রহ্মচর্যের বাণী ভারত হইতে বহু দূর দেশে বহন করেন। এসেনিগণ বৌদ্ধগণের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হন এবং খ্রীষ্টানগণ অংশতঃ উহা নব্য প্লেটোবাদীদের নিকট এবং অংশতঃ এসেনিদের নিকট শিক্ষা করেন।

কিন্তু ভারতের মত অন্য কোন দেশই ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তায় এত গুরুত্ব আরোপ করে নাই। হিন্দুদের নিকট ব্রহ্মচর্যই জীবনের দৃঢ়তম ভিত্তি। ভগিনী নিবেদিতা সত্যই মন্তব্য করিয়াছেন যে সর্বদেশে ছাত্রজীবনের যে সকল আদর্শ উদ্‌ভাবিত হইয়াছে তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্যই উচ্চতম ও মহত্তম। যোগশাস্ত্র অনুসারে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভের উৎকৃষ্ট উপায় ব্রহ্মচর্য। আয়ুর্বেদমতে 'ধর্মার্থকামমোক্ষানাম্ আরোগ্যমূলমুত্তমম্' অর্থাৎ রোগ-রাহিত্য বা উত্তম স্বাস্থ্যই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুবর্গের মূল। কিন্তু বীর্যধারণই সুস্থতার মূলীভূত কারণ। সর্ব ধর্মের শাস্ত্রসমূহে উহার সৃজনীশক্তি প্রশংশিত এবং উহা ধর্মজীবনের মূল ভিত্তিরূপে কথিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ধর্ম্মপ্রাণা বিধবা ও ধর্ম্মপিপাসু পুরুষদের আলোচনা করিতে পারি। তাঁহারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগের ব্রতে দীক্ষিত হন বলিয়া সাধারণতঃ প্রবৃদ্ধ বয়সেও যৌবনসুলভ স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষা করেন এবং অসাধারণ ভাবে দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন।

—দুই—

প্রতিভা-জগতে ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য

ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলেন, "যে সকল মহাজ্ঞানী এবং অধিকাংশ আদর্শবাদিগণ দৈবী সৃজনী শক্তিসম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা সুস্পষ্টভাবে অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিয়াছেন যে, যৌন শক্তির দৈহিক ও মানসিক অপব্যয় বন্ধ করিলে প্রচুর সৃজনীশক্তি ও সুসমীকৃত উদ্যম সৃষ্ট হয়।" এমন কি; ধর্ম্ম বিষয়ে যাঁহারা স্বাধীন চিন্তা করেন সেই সকল ভোগবাদীরাও, যথা বিঠোভেন, বালজাক্ এবং ফ্লবার্ট—ইহা অনুভব করিয়াছেন। একদিন যৌন ভোগেচ্ছা দমনান্তে বিঠোভেন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, উচ্চতর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ঈশ্বর এবং সৃজনক্ষম শিল্পের জন্য আমি আত্মশক্তি রক্ষা করিব। ইতালীর অমর চিত্রকর মাইকেল এঞ্জেলোর নিকট যখন বিবাহের প্রস্তাব করা হয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন, চিত্রবিদ্যা এমন এক ঈর্ষান্বিতা গৃহকর্ত্রী, যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে থাকিতে দেয় না। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনি বিবাহ করেন নাই কেন?" তদুত্তরে তিনি সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "আমি ইতোমধ্যে বিবাহ করিয়াছি, তবে রসায়ন বিদ্যারূপ রাণীকে!" যখন বাংলার অমর দেশভক্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার বিবাহের বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরুদ্ধ হন তখন তিনি সরলভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন, "স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমি সর্বান্তঃকরণে এত ব্যাপৃত যে, নিজ বিবাহের কথা ভাবিবার সময় পাই না।"

দার্শনিক প্লেটো গ্রীসদেশীয় মল্লযোদ্ধাদের ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেন। 'আত্মসংযম বনাম আত্ম-প্রশ্রয়' নামক গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধী বলেন, 'বীর্যধারণের প্রভাবেই আমি অমিত মনঃশক্তি ও দৈহিক সামর্থ্যের অধিকারী হইয়াছি।" মহাত্মাজী তাঁহার সাধুসুলভ সারল্য সহকারে স্বীকার করেন,

"যদি বিশ বৎসর যৌন ভোগের পর আমি এই অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হই তাহা হইলে আমি আরও কত উন্নত হইতে পারিতাম, যদি আমি উক্ত বিশ বৎসর নিজেকে সংশুদ্ধ ও সংযত রাখিতাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, যদি আমি সমগ্র জীবনে শুধু অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনে সমর্থ হইতাম তাহা হইলে আমার উদ্যম ও উৎসাহ সহস্র গুণে বর্ধিত হইত। যদি আমার মত অপূর্ণ ব্রহ্মচারী এত উপকার লাভ করিতে পারে তাহা হইলে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা আমরা কত অধিক, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তিলাভে সমর্থ হইতাম।" গান্ধীজী আরও বলেন যে, রাষ্ট্রনীতি তাঁহার জীবনের অকিঞ্চিৎকর বহির্ভাগ মাত্র এবং ব্রহ্মচর্যই তাঁহার জীবনের স্থায়ী ও মূল ভিত্তি। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার গৃহী শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, জরা-ব্যাধি প্রভৃতি অতিক্রম করিবার একমাত্র কৌশল ব্রহ্মচর্য।

ল্যাম্বিকাস বলেন, "দেবতারা সেই সকল প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না, যাহারা যৌন ভোগের দ্বারা অশুদ্ধ হইয়াছে। ইসলাম ধর্মেও মক্কা যাত্রা কালে যৌন সম্ভোগ নিষিদ্ধ। ইহুদী তীর্থযাত্রিগণ যখন সিনাই পর্ব্বতে উপস্থিত হন ও সেই মন্দিরে প্রবেশ করেন তখন তাঁহাদিগকেও ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হয়। দীক্ষাগ্রহণাদি কালেও খ্রীষ্টান ধর্মে বীর্যধারণ প্রস্তুতিরূপে শাস্ত্রবিহিত। খ্রীষ্টান আচার্যগণ ও সাধকবৃন্দ ব্রহ্মচর্যের পালন ও প্রশংসা করেন। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মে গীর্জাস্থ ধর্মযাজকগণ সর্বদা ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং সন্ন্যাসীদিগের মধ্য হইতে মনোনীত হইতেন। বস্তুতঃ স্বদেশ ও জগতের প্রতি ব্রহ্মচারী সাধকগণ ও মনীষীগণ যে প্রভূত উপকার করিয়াছেন তদ্রূপ অন্য কেহ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেন্ট পল, ইমানুয়েল কাণ্ট এবং আইজ্যাক নিউটনের নাম করা যাইতে পারে। বাইবেলে যীশু খ্রীষ্ট বলিতেছেন, মর্ত্তধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই খোজারা অবিবাহিত জীবন ও ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

———

—তিন—

ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধী অভিমত

একদল বৈজ্ঞানিক আছেন ভারতে ও অন্য দেশে যাঁহাদের মতানুবর্ত্তী নরনারীর সংখ্যা নাই। তাঁহাদের মতে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য একটী বিপজ্জনক অভ্যাস। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী ও নিন্দাকারী। তাঁহারা যুক্তি দেন, যৌন গ্রন্থিসমূহ হইতে দেহাভ্যন্তরে যে রস নিঃসৃত হয় তাহা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চাত হইলে দেহের উপর বিষ-ক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। তাঁহাদের ধারণা, বৈজ্ঞানিক লইসেলের পরীক্ষা দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। লইসেল নাকি যৌন গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস অন্য প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া উক্তরূপ বিষ-ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধে তৎপ্রদত্ত দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, অণ্ডকোষ হইতে নিঃসৃত উক্ত জৈব রস অধিক পরিমাণে জমিলে উগ্র গ্রন্থিগুলির অনিষ্ট সাধন করিতে পারে; এমন কি, ইহার ফলে সেইগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। রিগ্যাণ্ড ও মিঙ্গাজিনির পরীক্ষা দ্বারা এই যুক্তি সমর্থিত হয়। এই বৈজ্ঞানিক-দ্বয় আমেরিকার শূকর জাতীয় জন্তু বিশেষ এবং অন্যান্য স্ত্রী পশুর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বাধ্যকর বীর্য্যধারণের ফলে উল্লিখিত পশুদের দেহে বিষময় প্রতিক্রিয়া এবং অপকারী পরিবর্তন লক্ষিত হয়। উক্ত ফল হইতেই তাঁহারা এই অনুমান করেন। এতদ্ব্যতীত কিস্ক এবং লোর‍্যাণ্ড কয়েকটি ঘটনায় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, অনিচ্ছাকৃত বীর্য্যধারণের ফলে পুরুষ পুরুষত্বহীন হয় ও নারীর মাসিক ঋতু অকালে বন্ধ হয়। অবশেষে তাহারা মন্তব্য করেন যে, ব্রহ্মচর্য্য স্নায়ু-মণ্ডলীরও অনিষ্টকর এবং মূর্চ্ছারোগ ও স্নায়ুরোগাদি উৎপাদক। তাহাদের মতে অধিকাংশ স্নায়ুরোগ অবিবাহিত

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে উৎপন্ন হয় এবং অনেক সময় তাহাদের মেজাজ খিট্‌খিটে হয়।

মুণ্ডে, ক্রাঙ্কশিন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞগণ উক্ত প্রকার অভিমত পোষণ করেন এবং বলেন, "জননেন্দ্রিয়ের অব্যবহার দ্বারা যৌন এণ্ডোক্রিন গ্রন্থিসমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।" সেইজন্য ফাউলার, বার্টিলন প্রমুখ ব্যক্তিগণ পরামর্শ দেন যে, সাময়িক ব্যবধানে নিয়মিত যৌন সম্ভোগ স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে প্রয়োজন। বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক জে. এ. হ্যাডফিল্ড তাহার "মনোবিজ্ঞান ও নীতি" নামক ইংরাজী গ্রন্থে বলেন যে, 'যৌন সুখ পাশবিক' এই ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে জননেন্দ্রিয় অব্যবহৃত রাখিলে নর-নারীর খিট্‌খিটে মেজাজ ও প্রীতিহীন স্বভাব হয়। 'প্রেম ও মৃত্যুর নাটক' নামক ইংরাজী গ্রন্থে এডোয়ার্ড কার্পেণ্টার অভিমত প্রকাশ করেন যে, যৌন জীবনের প্রতি সমুচ্চ অবজ্ঞা রাখিয়া, কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক আদর্শে হৃদয়ের প্রীতি নিবদ্ধ করার চেষ্টা সমান ভাবেই অসম্ভব। যেমন রঙ ব্যতীত চিত্রাঙ্কন কল্পনাতীত তদ্রূপ ইহাও ব্যর্থতারই নামান্তর। যথাস্থানে এই বিরুদ্ধ মতাবলীর যথাযথ সমালোচনা দেওয়া হইবে।

—চার—

কৌমার্য্য সম্পর্কে আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার, আল্‌ডাশ হাক্সলি ও ডেভিড থোরো

প্রসিদ্ধ মার্কিণ লেখক আপ্‌টন সিনক্লেয়ার অত্যন্ত ভ্রান্ত ভাবে কৌমার্য্যের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন যে, ইহাতে স্থায়ী ও নিয়মিত ভাবে প্রীতি দমিত ও সীমিত হয়। উক্ত মিথ্যা ধারণার বশে তিনি মনে করেন, চির কৌমার্য্য বিকৃত জীবন, প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘনমাত্র মস্তিষ্ক ও নৈতিক রোগ বিশেষ, অবজ্ঞেয় প্রাচীন আদর্শ, প্রেমের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদ স্বরূপ। অবশ্য তিনি কৌমার্য্য ও বিশুদ্ধির মধ্যে ভেদসূচক রেখা টানিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মচর্যের ও বিশুদ্ধির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে আমরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হই। কারণ তাঁহার মতে স্থায়ী ও নিয়মিত কামদমনই ব্রহ্মচর্য। কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যে প্রেম অস্বীকৃত নহে। সেইজন্য তিনি মনে করেন, বিশুদ্ধিই যৌবনের অন্যতম মৌলিক ধর্ম এবং প্রকৃত ও স্থায়ী প্রেম সাধনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। যদি ইহাই বিশুদ্ধির লক্ষণ হয় তাহা হইলে আমাদের মতে কৌমার্য বা ব্রহ্মচর্য বিশুদ্ধি সাধন ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কারণ জীবনে কামের মূলোচ্ছেদ এবং বিশুদ্ধ প্রেম প্রতিষ্ঠাই ব্রহ্মচর্যের চরম লক্ষ্য। অপরপক্ষে ব্রহ্মচারী ব্যক্তিগণ প্রকৃত প্রেম প্রকাশে সমর্থ এবং তাঁহাদের প্রেম কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে আবদ্ধ নয়, সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত। মূঢ় ব্যক্তিগণ ভাবেন যে নরনারীর প্রেম দৈহিক প্রকাশ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হয় না। বর্তমান যুগে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ব্রহ্মচর্যরূপ সুপ্রাচীন সত্যের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত। আবহমান কাল হইতে ভারতে এই মহাসত্য যুগে যুগে প্রমাণিত ও প্রচারিত হইয়াছে যে, দৈহিক ঘনিষ্ঠতার কোন বিবেচনা বা লিঙ্গভেদের উপর প্রেম নির্ভরশীল নহে।

যৌন জীবন সম্বন্ধে অনেক আধুনিক লেখক প্রজনন ক্রিয়া হইতে প্রেম জীবনকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে আগ্রহান্বিত। যদিও প্রকৃতিতে উভয় বস্তুর সমাবেশ একত্র দৃষ্ট হয় তথাপি তাঁহারা প্রেমজীবনকে স্বতন্ত্র মূল্য দিতে ইচ্ছুক এমন কি, নিকোলাস বার্ডিয়েভের মত খ্রীষ্টান লেখকও এই যুক্তি দেন যে, প্রেমকে প্রজননের উপর নির্ভরশীল বা অধীনস্থ করা গবাদি পশু প্রজননকে মানবীয় সম্বন্ধে পরিবর্তিত করার তুল্য। আধুনিক গুজরাটের শ্রেষ্ঠ কবি নানালাল তাহার উৎকৃষ্ট নাটক 'জয়া ও জয়ন্ত' তে দেখাইয়াছেন, স্থুল দৈহিক মিলন বা যৌন সম্বন্ধ ব্যতীত প্রেম সম্ভব। তাঁহার নাটকে উল্লিখিত রাজকুমারী জয়া ও রাজকুমার জয়ন্ত পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা সারা জীবন পরিণয়ে আবদ্ধ না হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন। জয়ন্ত সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হন এবং জয়া চিরকুমারী থাকিয়া ব্রত গ্রহণ করেন "ইহজীবনে কোন পুরুষের কাম স্পর্শে আমার দেহকে কালুষিত করিব না। যেমন বিদ্যুৎস্পর্শে আগুন জ্বলে তেমনি আমার কুমারী দেহ অন্য ব্যক্তির স্পর্শে উত্তপ্ত ও অশুদ্ধ হয়।" জয়া এবং জয়ন্ত অনন্ত পথের তীর্থযাত্রীরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত কৌমার্য ব্রতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবি নানালাল বলেন, যখন নরনারী কামদেবকে পরাজিত করিবে তখন মর্তলোক জ্যোতির্ময় দেবলোকরূপে আলোকিত হইবে। যখন কামাদি রিপু শান্ত হয় তখন জগজ্জয় হয়। কামজয় দ্বারা জগজ্জয় সম্ভব।

উক্ত নাটকের উপক্রমণিকায় কবি নানালাল যথার্থই মন্তব্য করেন, "ইহা সত্য যে, এইরূপ জীবন-ব্রত অধিকাংশ জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ব্রত ভঙ্গ করেন নাই এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশে এবং ইউরোপে মঠবাসীগণের জীবনকাহিনী সমান ভাবে বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল নয়। তথাপি চিরকুমার হনুমানের জীবনের যে আদর্শ রামায়ণে চিত্রিত তাহার চিরন্তন বাণী মানবজাতি ভুলিলে চলিবে না। মহাযোদ্ধা চিরকুমার

ভীষ্মের জীবনে মহাভারত উক্ত আদর্শই জাতির সম্মুখে ধরিয়াছেন। ক্রমবর্ধমান ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছার যুগে ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল সুযোগ সেচ্ছায় ত্যাগের মহিমা-গীতি অনেকের কাছে শ্রুতিকটু ও কর্কশ ঠেকিবে। প্লেটোক্ত প্রেম ও কৌমার্য্যের পথ মসৃণ নয়। উক্ত পথে অজস্র প্রলোভন এবং পদে পদে অসংখ্য বাধা বিদ্যমান। কিন্তু দুর্লভ ত্যাগী জীবনের বীরত্ব সমস্ত বিপদের মধ্যে অটল বিশ্বাসে এবং অবিচলিত মনোভাবে প্রকটিত হয়। স্পষ্টভাবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই পথ যাহার তাহার উপযোগী নহে। যে সকল নর-নারীর অসামান্য আত্মসংযম আছে, কেবলমাত্র তাহাদের নিকট এই পথ সুগম।" সেইজন্য ঋষিগণ বলেন, ধর্ম-পথ ক্ষুরধারবৎ নিশিত।

প্রীতি নৈর্ব্যক্তিক হইলেই সম্যক্ বিশুদ্ধ থাকে। যখনই ইহা ব্যক্তিগত হয় তখনই ইহা কামযুক্ত ও কলুষিত হয়। দেহবদ্ধ প্রেমের নামান্তরই কাম। মার্কিন ঋষি হেন্‌রী ডেভিড থোরো সত্যই বলেন যে, পুষ্পোদ্যান ও বেশ্যালয়ের মধ্যে যত ব্যবধান, প্রেম ও কামের মধ্যে তত দূরত্ব বিদ্যমান। থোরো বলেন, "আমাদের বান্ধবীকে আমরা এরূপ ভালবাসিব যে, তিনি যেন পবিত্রতম ও বিশুদ্ধতম চিন্তারাশির সহিত সংশ্লিষ্ট হন।" পরস্পরকে এমন ভালবাসা উচিত যে, সেজন্য কাহাকেও যেন ভবিষ্যতে অনুতপ্ত না হইতে হয়। যখন স্নেহশীল ব্যক্তিগণ উচ্চতর প্রকৃতির সাহায্যে সহানুভূতি করেন তখন শুদ্ধ প্রেম জন্মে। কিন্তু তাঁহারা যখন নিম্নতর প্রকৃতির প্রেরণায় সমবেদনা দেখান তখন কাম উৎপন্ন হয়। গভীর প্রীতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে পরস্পরকে অশুদ্ধ ও কলুষিত করার সম্ভাবনা আছে। থোরো আরো বলেন যে, পবিত্রতা একটা ইতিমূলক গুণ, ইহা কখনো নেতিমূলক নহে। বিশেষতঃ বিবাহিত জীবনে এই ধর্ম পালনীয়। কোন সাধক আমার নিকট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, প্রীতি যখন অশুদ্ধ ও দৈহিক হয় তখন ইহা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রীতি প্রতিক্রিয়া বর্জিত। ইংরাজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল 'আমি কি বিশ্বাস করি' নামে একটি ছোট বইতে স্বীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উহাতে তিনি বলেন, প্রীতির দুইটি দিক আছে—ব্যক্তিগত আনন্দলাভ ও প্রিয়পাত্রের কল্যাণ কামনা। প্রীতির মধ্যে ব্যক্তিগত আনন্দ যতই কম থাকে ততই উহা বিশুদ্ধ হয়। কল্যাণ কামনাই প্রীতির নৈর্ব্যক্তিক অংশ। এই অংশ যতই সমৃদ্ধ হয় ততই প্রীতি নিঃস্বার্থ ও ব্যাপক হয়। পবিত্রতা বা ব্রহ্মচর্য ব্যতীত নৈর্ব্যক্তিক প্রেম অসম্ভব। প্রেম স্বাভাবিক চিত্তধর্ম। যখন উহা দেহধর্মে পরিণত হয় তখন উহার নাম কাম। যখন উহা বিশুদ্ধ আকারে আত্মধর্মের রূপ ধারণ করে তখন উহার নাম হয় প্রেম।

বাইবেলে আছে, প্রীতিই জীবনের মূলধর্ম্ম। উহার অর্থ প্রীতি আত্মিক, দৈহিক নহে। প্রীতিকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে ইহা হইতে দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হয়, ইহাকে আত্ম-ভূমিতে তুলিয়া লইতে হয়। প্রীতির অধ্যাত্মরূপ দানের অর্থ প্রিয় পাত্রের মধ্যে ঈশ্বর-বুদ্ধি করা। বাংলার নট-ভৈরব ও নাট্য-সম্রাট গিরিশ ঘোষ 'বিল্বমঙ্গল' নামক তাঁহার বিখ্যাত নাটকে প্রেম-তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানের আলোকে অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিল্বমঙ্গল পতিতা নারী চিন্তামণিকে এত প্রমত্তভাবে ভালবাসিয়াছিলেন যে তাহাকে না দেখিয়া তিনি একটি দিনও কাটাইতে পারিতেন না। এমন কি, পিতার শ্রাদ্ধ দিবসেও তিনি গভীর রাত্রিতে প্রিয়তমার দর্শনে অধীর চিত্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তখন তিনি এত প্রেমোন্মত্ত ছিলেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান প্রায় তিরোহিত হইয়াছিল। পথে প্লাবিতা নদীকে তিনি গলিত শবদেহের সাহায্যে অতিক্রম করেন। প্রেমের নেশায় মৃতদেহকে তিনি ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড বলিয়া জ্ঞান করেন। নিশীথে চিন্তামণির গৃহদ্বার অন্দর হইতে বন্ধ ছিল। তিনি দেখিলেন, দেওয়াল হইতে একটি কালো মোটা দড়ি ঝুলিতেছে। ইহার সাহায্যে তিনি সমুচ্চ দেওয়াল অবিলম্বে অতিক্রম করেন। কিন্তু উহা তো রজ্জু নয়, জীবন্ত কালসর্প! গভীর নিশীথে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া চিন্তামণি চমৎকৃতা হইল। বিল্বমঙ্গলের অপার অতুল প্রেম তাহাকে অবাক্ করিল। সে বলিল, "আমার প্রতি তোমার যত টান,

যত প্রেম, তা যদি ঈশ্বরের প্রতি হত তা হলে তুমি তাঁকে নিশ্চয়ই পেতে।" চিন্তামণির কথায় বিল্বমঙ্গলের জ্ঞান-চক্ষু খুলিল। সে বুঝিতে পারিল, "অল্পকে, সসীমকে ভালবাসিয়া মানুষ কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। পার্থিব বস্তু বা ব্যক্তি মানুষকে চরম সংতৃপ্তি দানে অসমর্থ!" সেইদিন হইতে তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। সেইজন্ত বৈদিক ঋষি ঘোষণা করিয়াছেন, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি!" অর্থাৎ ভূমাই, অসীমই সুখের উৎস। অল্পে বা সসীমে সুখ নাই।

বিল্বমঙ্গলের জীবনের সহিত তুলসীদাসের জীবনের সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান তুলসীদাসও বিল্বমঙ্গলের ন্যায় তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি প্রিয়া সন্দর্শনে গভীর রাত্রিতে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হন। তখন পত্নী বিরক্ত হইয়া পতিকে তিরস্কারের সুরে বলিয়াছিলেন—

হাড়মাসকী দেহ মম তা পর জিতনি প্রীতি।
তিসু আধি যো রামপ্রতি অবশি মিটিহি ভব-ভীতি॥

অর্থাৎ আমার অস্থিচর্ম্মময় দেহের প্রতি তোমার যে আসক্তি হইয়াছে তাহার অর্ধেক যদি ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রতি হইত তাহা হইলে তোমার ভব-ভয় অবশ্যই দূর হইত। তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শন পাইতে।

পত্নী গুরুর কাজ করিলেন। পত্নীর তিরস্কারে পতির বৈরাগ্য জন্মিল, জ্ঞান চক্ষু খুলিল। তিনি ভগবদ্দর্শনের জন্য সংসার ত্যাগ করিলেন এবং পত্নী-প্রেমের মোড় ভগবদ্মুখী করিয়া রাম-দর্শন লাভে ধন্য হইলেন। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, "সতীর পতির উপর যে টান মায়ের সন্তানের প্রতি যে টান এবং বিষয়ীর বিষয়ের উপর যে টান—এই তিন টান মিলিতভাবে ঈশ্বরের প্রতি দিলেই ঈশ্বর দর্শন হয়।

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত দাঁড়াইতে পারে না। বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য অত্যাবশ্যক। বিবাহিত জীবনে সংযম সাধনার সমস্যা সম্যক্ ভাবনা করিলে আপটন সিনক্লেয়ার নিশ্চয়ই স্বীকার

করিবেন যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন বা বীর্য্যধারণ মানব জীবনে অপরিহার্য্য। আল্‌ডাস হাক্সলি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "এণ্ডস্ এ্যাণ্ড মীন্স" এর শেষ অধ্যায়ে নৈতিক সমস্যার সমাধানার্থ মন্তব্য করেন, "কিয়ৎ পরিমাণে যৌন সংযম বা ব্রহ্মচর্য্যই সর্বপ্রকার মানসিক শক্তি লাভের পূর্ব্ব সর্ত। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি যৌন সংযমের অভাবে পূর্ণভাবে বিকশিত হয় না।" তিনি জোর দিয়া বলেন, পবিত্রতাই জীবনের প্রধানতম গুণ বা ধর্ম। কারণ, ইহা ব্যতীত সমাজ উদ্যমহীন হইবে এবং ব্যক্তিগণও চিরন্তন অবসাদ, অন্যমনস্কতা, আসক্তি ও পশুত্বে অভিভূত থাকিবে। তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন যে, পশুত্বের উর্দ্ধে কোন প্রকার নৈতিক জীবনের আবশ্যকীয় প্রাথমিক অবস্থাই পবিত্রতা।

—পাঁচ—

বৈজ্ঞানিক আলোকে ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগিতা

ডক্টর ম্যালচাউ মনে করেন যে, দেহমধ্যস্থ যৌন গ্রন্থিসমূহের অভ্যন্তরীন নিঃস্থত রসের সংরক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও আয়ুবর্দ্ধক। তিনি বলেন, "যৌন সম্ভোগের সময়ে যে শুক্র ধাতু ক্ষরিত হয় তাহা অসার পদার্থ নহে এবং উহার সংরক্ষণ আদৌ অনিষ্টকর নহে" তাঁহার মতে উক্ত ধাতুর সংরক্ষণ বিশেষ ভাবে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুদৃঢ় করে। কারণ জৈব রাসায়নিক মিতব্যয় স্বাস্থ্যকর ও অয়ুবর্ধক। শুক্রক্ষয়ে প্রচুর পরিমাণে লৌহ, ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম পদার্থ দেহ হইতে নিঃস্থত হয়। ম্যালচাউ তাঁহার 'যৌন জীবন' নামক পুস্তকে (৩৪ পৃষ্ঠায়) মন্তব্য করেন, ইহা মানবীয় মনোবিজ্ঞানের একটি সুগভীর ও বিচারমূলক জ্ঞান, যাহার আলোকে যৌন সংযম বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অধিকতর উৎসাহ, গভীরতর অনুরাগ ও প্রবলতর মনোযোগ লাভের উদ্দেশ্যে ইহা অপরিহার্য্য। প্রাকৃতিক চিকিৎসা নামক বিখ্যাত ইংরাজী পুস্তকে (২য় খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা) ইহা কথিত আছে যে, শুক্র-ধাতুই প্রাণশক্তির বাহক। শুক্রক্ষয় বন্ধ রাখিলে উহা যৌন গ্রন্থির মাধ্যমে রক্তে মিশ্রিত হয় এবং দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সামর্থ্য ও উদ্যম বৃদ্ধি করে। শারীর চর্চ্চায় বিশ্বকোষ নামক সুবৃহৎ ইংরাজী গ্রন্থে (৫ম খণ্ড, ২৪৫০ পৃষ্ঠা) উল্লিখিত আছে, এক অংশ শুক্র বহু অংশ শুদ্ধ রক্তের সমান এবং যখন সেই শুক্র পুনরায় রক্তে মিশ্রিত হয় ইহা স্নায়ুশক্তিতে পরিণত হয়। ডাক্তার পোইরেল স্পারমাইন সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার ফল এই বিষয়ের উপর অপূর্ব আলোক সম্পাত করে। পুনর্যৌবন লাভের জন্য তিনি সক্রিয় হারমোন সহযোগে যে আধুনিক চিকিৎসা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহার দ্বারা উল্লিখিত মন্তব্যও

বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে মানুষের স্বাভাবিক আয়ু এক শত বৎসর। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ মহাকবি মিল্‌টন বলেন, "মানুষ একশত বা তদধিক বৎসর বাঁচিতে পারে, ইহা কোন কাল্পনিক মন্তব্য বা আকাঙ্ক্ষা নহে। মনোবৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে দেহ-মনের পূর্ণ বৃদ্ধিলাভ করিতে যত বৎসর আবশ্যক হয় তাহার অন্ততঃ পাঁচ গুণ কাল মানুষের আয়ু হইতে পারে। পশু জগতে এই বহুল প্রচলিত নিয়মের দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র দেখা যায়। ঘোড়া বর্ধিত হইতে প্রায় চার বৎসর লাগে এবং প্রায় বার হইতে চোদ্দ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। আট বৎসরে একটি উষ্ট্র বড় হয় এবং সে প্রায় চল্লিশ বৎসর বাঁচে। কুড়ি হইতে পঁচিশ বৎসরে মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় জীবনদীপ নির্বাপিত না হইলে মানব জীবনের সাধারণ আয়ু এক শত বৎসরের কম হইবে না। সুতরাং বীর্যধারণই দীর্ঘজীবন লাভের উৎকৃষ্ট উপায়।

আরও অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক আছেন, যাহারা ম্যালচাউর মত সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং বলেন, "কৌমার্য্যই আয়ুবৃদ্ধির সুকৌশল।" ডক্টর নিকলস লিখিয়াছেন "ইহা ঔষধ বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্বের একটি মৌলিক সত্য যে, পুরুষ ও নারী উভয় দেহে প্রজনন-শক্তি বর্ধনে দেহের শ্রেষ্ঠ রক্তই প্রধান উপাদান। পবিত্র ও সংযত জীবনে শুক্রই দেহে পুনরায় সংমিশ্রিত হয় এবং সূক্ষ্মতম মস্তিষ্ক, সুদৃঢ় স্নায়ু ও পৈশিক তন্তু সৃজনে নিয়োজিত হয়। এই ধাতু রক্তে পুনর্বাহিত ও সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া মানুষকে তেজস্বী, সবল, সাহসী ও সুবীর করে। এই ধাতু অযথা ব্যয়িত হইলে মানুষ নারীভাবাপন্ন, শক্তিহীন, অদৃঢ়চেতা, ক্ষীণবুদ্ধি, ভগ্নদেহ, যৌনক্রিয়াসক্ত, অবসাদগ্রস্ত, বিশৃঙ্খলা পরায়ণ, স্নায়ুশক্তিশূন্য, মৃগীরোগাক্রান্ত, উন্মত্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডক্টর নিকল্‌স আরও বলেন যে, জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার বন্ধ রাখিলে দৈহিক ও মানসিক শক্তি ও নৈতিক জীবনের লক্ষ্যণীয় বিবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন, "একবার যৌন সম্ভোগে যে

শক্তি ক্ষয় হয় তাহা সাত দিন শারীরিক পরিশ্রমে যে শক্তি ব্যয়িত হয় বা চব্বিশ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রমে যে শক্তির অপগম হয় তাহা, তাহার সমান একবার যৌন সম্ভোগ স্নায়ুমণ্ডলীকে অতিশয় দুর্ব্বল করে এবং নৈতিক শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

—ছয়—

প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মন্তব্য

আলোচ্য বিষয়ের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণের যে সকল প্রশংসাপত্র নিম্নে উল্লিখিত হইল তাহা হইতে নিঃসংশযে প্রমাণিত হয়, ব্রহ্মচর্য্য পালন বা বীর্য্যধারণ আদৌ অনিষ্টকর বা অসম্ভব নহে এবং ইহা সর্বথা সম্ভব ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

জার্ম্মাণির টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুতপূর্ব অধ্যাপক অষ্টারলেন বলেন, "যৌন সংস্কার এত অন্ধ ও শক্তিমান্ নহে যে, নৈতিক শক্তি ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা ইহা সংযত এবং এমন কি, সম্পূর্ণ দমন করা যায় না। উপযুক্ত বয়স না আসা পর্য্যন্ত তরুণীর ন্যায় তরুণেরও যৌন সংযম শিক্ষা করা উচিত। সকলের জানা উচিত, এই স্বেচ্ছাকৃত সম্ভোগ বিসর্জনের পুরস্কার সবল স্বাস্থ্য ও চির-নূতন মহাশক্তি। ইহা পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য যে, যৌন সংযম এবং পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও নীতি-বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর সহিত সম্পূর্ণ সমঞ্জস এবং ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিবিজ্ঞান ত দূরের কথা, স্বাস্থ্য তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের আলোকেও যৌন প্রশ্রয় সমর্থনীয় নহে

লণ্ডনস্থ রয়্যাল কলেজের অধ্যাপক স্যার লিওনেল বীল বলেন, "মানব সমাজের মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণের উদাহরণ সর্বকালে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে যে, সবল ও সংযত ইচ্ছাশক্তি এবং জীবন-যাত্রা ও জীবিকার্জনের প্রণালী উন্নয়ন দ্বারা দুর্জয় ইন্দ্রিয় ও পুরাতন কুসংস্কারকে সম্যক্ দমন করা যায়।" বীর্য্যধারণ অদ্যাবধি কাহারো পক্ষে অনিষ্টকর হয় নাই, যখন ইহা শুধু বাহ্য উপায় প্রয়োগে পর্যবসিত না হইয়া চারিত্রিক উৎকর্ষের আকাঙ্ক্ষায় অনুসৃত হইয়াছে। প্রকৃত কৌমার্য্য অভ্যাস কষ্টকর নহে, যদি ইহা কোন সুমহৎ আদর্শানুরাগের অনুষঙ্গরূপে অবলম্বিত হয়। কৌমার্য্যের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বীর্য্যধারণ নহে; পরন্তু ভাব-শুদ্ধিই ইহার মুখ্য লক্ষ্য। গভীর বিশ্বাসের বলে ভাব শুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মহাশক্তি জন্মে।

সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক ফোরেল বলেন, "যৌন ভোগ বিঘ্নের সকল কারণই ভোগেচ্ছা বর্ধিত করে। এই সকল প্রলোভন এড়াইয়া চলিলে ইহার বেগ প্রশমিত হয় এবং ভোগবাসনা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। তরুণ-তরুণী মহলে এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত যে, বীর্য্যধারণ অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যাপার। অথচ বীর্য্যধারণে সমর্থ সহস্র সহস্র নরনারী একবাক্যে স্বীকার করেন যে, স্বাস্থ্যহানি আদৌ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়। রিবিং সাহেব বলেন, "পঁচিশ ত্রিশ বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক অসংখ্য ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য পালনে সমর্থ হইয়াছেন অথবা যাহারা বিবাহিত তাঁহারাও বিবাহকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী ছিলেন। এইরূপ লোকের সংখ্যাও অল্প নহে। তবে তাহারা স্বভাবতঃই নিজেদের জাহির করিতে চাহেন না। ডক্টর এ্যাক্টন বলেন, "বিবাহের পূর্বে তরুণ-তরুণীর পক্ষে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্ভব ও আবশ্যক।" ইংলণ্ডের রাজদরবারের তৎকালীন চিকিৎসক স্যার জেম্স পেজেট বলেন, তাহার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, "জীবন-পথে অন্য নীতি অপেক্ষা সংযমই উৎকৃষ্ট।"

ডক্টর ই. পেরিয়ার লিখিয়াছেন, "অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের কাল্পনিক বিপদ অত্যন্ত মিথ্যা ধারণা। ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত, যেহেতু ইহা শুধু বালক-বালিকাদের মনকে নহে, তাহাদের পিতামাতাদের মনকেও বিভ্রান্ত করে। ব্রহ্মচর্য্য যুবক-যুবতীর জীবনে দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক বর্মস্বরূপ।" স্যার এণ্ড্রু ক্লার্ক বলেন, "ব্রহ্মচর্য্য দেহ-মনের কোনরূপ অনিষ্ট করে না, ইহা স্বাস্থ্যোন্নতির বাধকও নহে; বরং ইহা উদ্যম ও উৎসাহের সাধক। ইহা ধারণা শক্তি সঞ্জীবিত ও সূক্ষ্মতম করে। অব্রহ্মচর্য্য আত্ম সংযমকে শিথিল করে, দীর্ঘ-সূত্রিতার অভ্যাস সৃষ্টি করে, সমগ্র সত্বাকে অবনত ও ম্রিয়মান করে এবং এমন দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপাদন করে যাহা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত হয়। তরুণ-তরুণীর স্বাস্থ্যরক্ষার্থ অব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক বলা শুধু ভ্রান্তি নহে, ইহা ভীষণ অন্যায় ও অমার্জনীয় অপরাধ। ইহা সর্ব প্রকারে বিভ্রান্ত ও অকল্যাণকর।"

ডাক্তার সারব্লেড লিখিয়াছেন, "অব্রহ্মচর্য্যের দোষ সুবিদিত ও অবিসংবাদিত। ব্রহ্মচর্য্যে তথা-কথিত দোষসমূহ কাল্পনিক। ইহার দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় তাহা বহু গবেষণাপূর্ণ বৃহদাকার গ্রন্থে বিবৃত। ব্রহ্মচর্য্যব্রতীরাই অব্রহ্মচর্য্যের দোষরাশি বর্ণনে সমর্থ। আর অব্রহ্মচারীরাই অব্রহ্মচর্য্যের গুণাবলীর নির্লজ্জ ইতিকথা রচয়িতা। অব্রহ্মচর্য্যের গুণরাজি বর্ণনায় যাঁহারা পঞ্চমুখ হন তাহারা চরিত্রহীন ও ধর্মবর্জিত এবং পশুপদবাচ্য। তাহাদের বিবৃতি যেমন অস্পষ্ট, তেমনি অর্থহীন ও অগ্রাহ্য।" বার্ণী-বাসী প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ ফরাসী অধ্যাপক ডাক্তার ডুবইস বলেন, "যাহারা ইন্দ্রিয়-পারতন্ত্র্যে আত্মহারা হয় তাহাদের মধ্যে স্নায়ু-দৌর্বল্য সমধিক দেখা যায়। আর যাহারা পশুত্ব-পাশ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে তাহারা সাধারণতঃ উক্ত রোগে আক্রান্ত হয় না।" বিসার্টার হাসপাতালের চিকিৎসক ডক্টর ফেরে কর্ত্তৃক উক্ত মত সম্পূর্ণ সমর্থিত। ডক্টর ফেরে বলেন, "যাহারা মানসিক বিশুদ্ধি সংরক্ষণে সমর্থ তাহারাই স্বাস্থ্যভঙ্গ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনে সাফল্যমণ্ডিত

হয়। কাম রিপু চরিতার্থতার উপর কখনো স্বাস্থ্য বা শক্তি নির্ভর করে না।"

অধ্যাপক আলফ্রেড ফার্উর্ণার বলেন, "তরুণ-তরুণীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিপদ সম্বন্ধে অনেক শোচনীয় ও অগভীর আলোচনা হইয়াছে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল বিপদের কথা তোমরা এত জোর দিয়া বলিতেছ তৎসম্বন্ধে আমি আদৌ অবহিত নহি। যদিও আমার ব্যাপক ও সুদীর্ঘ চিকিৎসা ব্যবসায়ে শত শত রোগী পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ আমি পাইয়াছি তথাপি উল্লিখিত বিপদসমূহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এখনো আমি পাই নাই। অকাল যৌন ভাব সম্পূর্ণ কৃত্রিম এবং মন্দচালিত লালনপালনের অনিবার্য্য কুফল।" ডাক্তার মণ্টেগাজা লিখিয়াছেন, "বীর্য্যধারণের ফলে রোগাক্রান্ত হইবার দৃষ্টান্ত আমি জীবনে কখনো দেখি নাই। কিন্তু অনৈতিক অসংযত জীবন যাপন দুরারোগ্য ব্যাধির উৎস তাহা কে অবগত নহে? ব্রহ্মচর্য্যহীনের দেহ অবর্ণনীয় গলিত নরককুণ্ডে পরিণত হয়। ইহার ফলে কল্পনা, হৃদয় ও বুদ্ধির ভীষণ অশুদ্ধিও আমরা বিস্মৃত হইব না। সকল নরনারী, বিশেষতঃ তরুণতরুণীরা, নিয়মিত বীর্য্যধারণের অমিত সুফল অচিরে লাভ করে। বীর্য্যধারণের ফলে স্মৃতি কত সুশান্ত ও সুস্পষ্ট হয়, মস্তিষ্ক কত সতেজ ও উর্ব্বর হয়, ইচ্ছাশক্তি কত সমৃদ্ধ হয় এবং সমগ্র চরিত্র কত সবলতা প্রাপ্ত হয় তাহা বীর্য্যহীনরা ধারণা করিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে আমাদের পরিপার্শ্ব যে স্বর্গীয় সুষমায় রঞ্জিত হয় তাহা চশমায় দেখা যায় না। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম বস্তুও ব্রহ্মচর্য্যের আলোকে আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। যে বিশুদ্ধ অনন্ত সুখের অন্ধকার বা অবসান নাই সেই সুখের সাগরে আমরা নিমজ্জিত হই।" ডাক্তার মণ্টোগাজা আরো বলেন, "যে তেজস্বী তরুণ-তরুণীরা বীর্য্যধারণ করে তাহাদের সমুজ্জল আত্ম-বিশ্বাস, অম্লান প্রফুল্লতা ও প্রীতিপূর্ণ সহাস্য বদন দেখা যায়। আর তাহাদের যে সঙ্গীরা কামরিপুর ক্রীতদাস তাহারা জ্বর-রোগীদের মত চঞ্চল,

অস্থির, উত্তেজিত ও বিকার-গ্রস্ত থাকে। উভয় দলের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত।"

১৯০২ খ্রী: বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌স নগরে স্বাস্থ্য ও নীতি বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক মহাসভার দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ১০২ জন বিশেষজ্ঞ যোগদান করেন। তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, "সর্বপ্রথমে তরুণ-তরুণীদিগকে এই সুনীতি শিক্ষা দেওয়া হউক যে, দেহ-মনের সংযম ও বীর্য্যধারণ আদৌ অনিষ্টকর নহে অধিকন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সকল সদ্‌গুণ সর্বাগ্রে পালনীয় ও সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত।" ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকগণ একমত হইয়া ঘোষণা করেন যে, বিশুদ্ধ সংযত জীবন স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর—এই ধারণা আমাদের সকলের পরিপক্ক অভিজ্ঞতার আলোকে ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত; এবং পবিত্র ও নৈতিক জীবন যাপনের ফলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা আছে সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ আমরা এখন পর্য্যন্ত পাই নাই।

ফরাসী মনীষী মঁসিয় রাইসেনের অভিমত এই যে, ব্যাধি ও ব্যায়ামের প্রয়োজনের ন্যায় যৌন ক্ষুধার অল্পতম পরিতৃপ্তিই স্বাস্থ্যকর ও সুখকর। তিনি বলেন, পুরুষ বা নারী দারুণ ব্যাঘাত, এমন কি, কষ্টকর অসুবিধা ও ভোগ না করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাসে সমর্থ। কেবলমাত্র অপ্রকৃতিস্থ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত নরনারীগণ সংযম সাধনে কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ইহা সত্যই কথিত হইয়াছে যে, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণ বীর্য্যধারণ করিলে কোন রোগেই আক্রান্ত হয় না। এই সত্য পুনঃ পুনঃ প্রচার করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ এই মৌলিক সত্য মানব সমাজ কর্তৃক কোন কালে ব্যাপক ভাবে অবহেলিত হইতে পারে না। জগতে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সংখ্যাই সমধিক। সুতরাং তাহাদের পক্ষে বীর্য্যধারণ অবশ্যই মঙ্গলজনক। অস্বাভাবিক বীর্য্যক্ষয়ের ফলে যে সকল কঠিন ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহা সর্বজনবিদিত। অতিরিক্ত পুষ্টি-প্রবাহের অভ্রান্ত

ও সরল পথ প্রকৃতি দেবী পুরুষের পক্ষে স্বপ্নদোষরূপে এবং নারীর পক্ষে মাসিক ঋতুরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বীর্য্যধারণ সুখময় স্বাস্থ্যধর্ম। বীর্য্যক্ষয় এমন এক অপরিচিত অতিথিকে দ্বারমুক্ত করিয়া দেয়, যে অদূর ভবিষ্যতে প্রাণহন্তা হইতে পারে। যৌন লালসা যে কোন বয়সে কষ্টকর হইলেও যৌবনে ইহা দারুণ বিকৃতির সূচনা করে। ইহার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির ও ইন্দ্রিয়বর্গের যে বিকৃতি ঘটে তাহা অপূরণীয় ও অসংশোধনীয়।"

যৌন ক্ষুধা দেহ মনের আসল অভাব বা প্রকৃত প্রয়োজন নহে। ডাক্তার ভিরী মন্তব্য করেন, "সকলেই জানেন, নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ বা পুষ্টির অভাব পূরণ না করিলে কি ক্ষতি হয়। কিন্তু সাময়িক ও আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে কোন সামান্য বা কঠিন ব্যাধি জন্মে—একথা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিবে না। সুস্থ জীবনে আমরা অসংখ্য সংযত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই যাহাদের চরিত্র-বল, ইচ্ছাশক্তি বা দৈহিক সামর্থ্য কোন অংশে কম নহে। তাহারা বিবাহিত হইলে পুত্রকন্যার জনক হইবার অযোগ্যও হন না। যে প্রয়োজন ব্যক্তিবিশেষে পরিবর্ত্তনশীল, যে প্রবৃত্তি উপভোগ ব্যতীতও শান্ত করা যায় তাহাকে প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি না বলাই সঙ্গত। বর্ধমান বালক বা বালিকার শারীরিক প্রয়োজন পূরণার্থ যৌন ভোগ নিষ্প্রয়োজন। অন্য পক্ষে দেহ-মনের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ সম্পূর্ণ যৌন সংযম অত্যাবশ্যক। যাহাদের জীবনে এই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘিত হয় তাহাদের স্বাস্থ্য কখনো পূর্ণতা বা পরিণতি প্রাপ্ত হয় না।"

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীর-তত্ত্বের অধ্যাপক বিখ্যাত ইংরাজ শরীর-তত্ত্ববিৎ জন জি. এম. কেণ্ডিক বলেন, "যৌন প্রবৃত্তির অন্যায্য সম্ভোগ কেবল নৈতিক দোষমাত্র নহে, দেহেরও অপূরণীয় ক্ষতি কারক। প্রশ্রয় দিলে এই অভিনব প্রয়োজন দুর্জ্জয় দৈত্যবৎ অনিষ্টকারী হয়। দুষ্টচিত্ত উহার কথায় কর্ণপাত করে এবং উহাকে প্রশ্রয় দেয়। প্রত্যেক নূতন ক্রিয়া অভ্যাস-শৃঙ্খলে এক একটী নূতন গ্রন্থি বাড়াইবে। এই কু-অভ্যাস ভঙ্গ করিবার শক্তি অনেকেরই

থাকে না এবং তজ্জন্য বহু লোকে অসহায়ভাবে দৈহিক ও মানসিক সর্বনাশ বরণ করে। অসৎ প্রবৃত্তি অপেক্ষা ঘোর অজ্ঞতার বশেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীরা এই মন্দ অভ্যাসের বশবর্তী হয়। সমগ্র সত্ত্বাকে সুনিয়মানুবর্তী এবং মনোগত ভাবরাশিকে বিশুদ্ধ রাখার অভ্যাস করিলেই সেই পাশবিক প্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে।" উল্লিখিত প্রকারে ডক্টর ফ্রাঙ্কে এস্‌কাণ্ডি মন্তব্য করেন, "যৌন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা ইহাকে একেবারে দমন করা যায়। ইহাকে যৌন প্রয়োজন না বলিয়া যৌন প্রবৃত্তি বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, ইহা আদৌ দৈহিক প্রয়োজন নহে, ইহার পূরণ ব্যতীত দেহ-মনের কোন অনিষ্ট হয় না। বস্তুতঃ ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীয় নহে, যদিও অনেকে ভ্রান্তধারণার বশে এইরূপ বলিয়া থাকেন। তাহারা যৌন প্রবৃত্তির যে কাল্পনিক সংজ্ঞা দেন তাহার মোহেই তাহারা যৌন সম্ভোগকে স্বাস্থ্যকর প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর প্রতি যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক আনুগত্য থাকিলে কেহই ইহাকে স্বাস্থ্যকর প্রয়োজনরূপে স্বীকার করিবেন না। প্রকৃত পক্ষে যৌন ক্রিয়া স্বেচ্ছাকৃত এবং দুষ্ট নীতি বা ভ্রান্ত ধারণার বশে অনুসৃত।"

যৌন সম্ভোগে জীবনী শক্তি আশ্চর্যজনক রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, শরীর ক্ষীণ হয়। বীর্য্য সংরক্ষণে জীবনীশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্য উন্নত, চক্ষু দীপ্তি-শালী এবং দেহ রূপ-লাবণ্যে মণ্ডিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তি দাতা। ব্রহ্মচারী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন এবং সর্বজন সমাদৃত হন।

———

—সাত—

বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য

ফয়েরষ্টার বলেন, "স্বেচ্ছাকৃত ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত জীবনকে অবনত করা ত দূরের কথা, বিপরীত পক্ষে ইহা বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রীতির শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। কারণ, ইহা স্থূলরূপে মানবের স্বাধীনতাকে তাহার স্বীয় প্রকৃতির চাপের বিরুদ্ধে প্রকটিত করে। ক্ষণিক খেয়াল ও যৌন উপদ্রব সম্পর্কে ইহা বিবেকবৎ কার্য্যকরী হয়। এই অর্থে কৌমার্য্যও বর্মতুল্য। কারণ ইহার অস্তিত্ব বিবাহিত নর-নারীকে তাহাদের দাম্পত্য প্রেম সম্বন্ধে পরস্পরকে অস্পষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির দাসমাত্ররূপে গণ্য করিতে বাধা দেয়। ইহা তাহাদিগকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রভুত্বে সমর্থ স্বাধীন মানবের স্থান গ্রহণ করিতে পথ দেখায়। যাহারা চির কৌমার্য্যকে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া উপহাস করে তাহারা সত্যই জানে না, তাহারা কি করিতেছে! তাহারা বুঝিতে পারে না, এই চিন্তাধারা তাহাদিগকে অবশ্যই বেশ্যাগিরি ও বহু বিবাহের সমর্থক করিবে। যদি প্রকৃতির চাহিদা অদম্য হয় তাহা হইলে বিবাহিত নর-নারীর পক্ষে বিশুদ্ধ অকামহত জীবন যাপন কিরূপে সম্ভব? অবশেষে তাহারা এই কথা ভুলিয়া যান যে, অসংখ্য পরিণয়ে বর বা কন্যা তাহাদের একজনের রুগ্নতা বা অন্য কোন অক্ষমতার জন্য কয়েক মাস বা বৎসর এমন কি সমগ্র জীবন বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য পালনে বাধ্য হয়। একমাত্র এই কারণেই ব্রহ্মচর্য্যকে আমরা যে মূল্য দিব তদনুসারে এক বিবাহ প্রথা দণ্ডায়মান থাকে বা ভূপতিত হয়।"

যে ম্যালথাস্ বর্তমান যুগকে লোকবৃদ্ধি এবং তৎপ্রতিকারার্থ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের মতবাদ প্রচার দ্বারা চমৎকৃত করিয়াছিলেন তিনিও কৌমার্য্যের পক্ষপাতী। মারাত্মক বিপদজাল হইতে মানব জাতিকে সংরক্ষণার্থ সৎসাহসের

প্রয়োজনীয়তাকে জীবনের মূলনীতিরূপে ম্যালথাসের মতবাদ গ্রহণ করে। ম্যালথাস স্বয়ং বিশ্বাস করেন যে, সৎসাহস বা সুনীতির উৎকৃষ্ট রূপ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যই বিবাহিত জীবনের জটিলতম সমস্যা সমাধানে সমর্থ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ম্যালথাসের আধুনিক শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্যের সমর্থক নহেন। তাহারা পাশবিক প্রশ্রয়ের অপরিহার্য ফল এড়াইবার জন্য রাসায়নিক ও কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে দেখা যায়, ব্রহ্মচর্য স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হউক, সাময়িক বা জীবনব্যাপী হউক, মধ্যযুগে এবং উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ইউরোপ এই সমস্যার সমাধানে যে অপূর্ব আলোকসম্পাত করিয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্যের কোন কারণ নাই।

উতবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে প্রচলিত বা স্বেচ্ছাকৃত কৌমার্যের অভ্যাস সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করা শিক্ষাপ্রদ হইবে। অভিজাত বংশসমূহে কৌমার্যের প্রথা বহুল প্রচারিত ছিল। ভূমধ্যসাগরগর্ভস্থ মাণ্টা দ্বীপে এবং অন্যান্য স্থানে বালক-বালিকা উভয়ের জন্য ব্রহ্মচর্য-ব্রত উপদিষ্ট ছিল। নিটমা নাম্নী ব্রহ্মচারিণী যে চিরকুমারী সংঘ প্রবর্তন করেন তাহাতেও ত্রিশ বৎসর অবিবাহিত থাকার প্রথা প্রচলিত ছিল। যাহারা সেই ব্রত-ভঙ্গ করিত তাহাদিগকে জীবন্ত কবর দেওয়া হইত। উক্ত কুমারীসংঘের ব্রতচারিণীগণ অসাধারণ প্রভাব এবং ব্যক্তিগত সম্মানের অধিকারিণী হইতেন। রাজবংশের মহিলাবর্গের ন্যায় তাঁহারা সাধারণতঃ সম্মানলাভ করিতেন। রাজপথে রক্ষকপুরঃসর হইয়া তাহারা অগ্রসর হইতেন এবং উচ্চতম রাজপ্রতিনিধিও তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতেন। উৎকৃষ্ট গাড়ীতে ভ্রমণের সুখ সুবিধা এবং আরাম তাহারা কথনো কথনো ভোগ করিতেন। সাধারণ ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে সম্মানসূচক স্থান দেওয়া হইত। তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় আইন মানিয়া চলিতে হইত না। বিশিষ্ট নাগরিকগণের ন্যায় তাহারা মৃত্যুর পর নগরের মধ্যেই ভূগর্ভে প্রোথিত

হইতেন। রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদানে তাহারা সমর্থ ছিলেন। কোন অপরাধীকে বধ্যভূমিতে যাইবার পথে তাহারা দেখিলে অপরাধীর জীবন রক্ষিত হইত। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশের পুরোহিতগণ সূর্যকুমার নামে অভিহিত হইতেন। তাহারা কোন অনৈতিক আচরণে লিপ্ত হইলে জীবন্ত সমাধির শাস্তিভোগ করিতেন। বৌদ্ধ সংঘ শ্রমণবৃন্দের উপর কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত বিধান করিয়াছিল। ব্রহ্মচর্য-ব্রত ভঙ্গ করিলে শ্রমণগণ সংঘ-চ্যুত এবং কাষায়-বর্জিত হইতেন। দার্জিলিংএ তিব্বতীদের একটি সুবৃহৎ উপনিবেশ আছে। তাহাতে কয়েক শত তিব্বতী কুলীর কাজে নিযুক্ত ছিল। তিব্বতে লামা-ব্রত ভঙ্গের জন্য যে কঠোর শাস্তি প্রচলিত ছিল তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভার্থ লামাগণ তিব্বত হইতে গোপনে পলায়নপূর্বক উক্ত উপনিবেশে কুলীর কাজ করিতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের তিব্বতীয় সংঘে ব্রতচ্যুত লামাগণ রাজপথে অপমানিত হইতেন এবং হাতে হাতে ধরা পড়িলে দৈহিক শাস্তি ভোগও করিতেন এবং সংঘ-চ্যুত হইতেন।

প্রাচীন ভারতে ছাত্রজীবনে বালক-বালিকা উভয়ের জন্যই ব্রহ্মচর্য্য পালন বাধ্যকর ছিল। এমন কি, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীগণ ৩৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত। ষ্ট্রাবোর মতে মেগাস্থিনিস লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীগণ গার্হস্থ্য আশ্রমে যোগদানের পূর্বে ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীরূপে গুরুগৃহে বাস করিত। এমন কি, রাজকুমারগণও ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচারীরূপে গুরুকুলে থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাল্যকালে তাঁহার সদগুরু সন্দীপন মুনির গৃহে নিবাস পূর্বক ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে বালকদের ন্যায় বালিকাদেরও উপনয়ন হইত। অনন্তর তাহারা বেদধ্যায়ন ও হিন্দুধর্মে দীক্ষালাভ করিত। ঋতুকাল না আসা পর্য্যন্ত তাহারা ব্রতচারিণী থাকিত। গোঁড়া স্মৃতিকারগণ কর্তৃক ইহা মুক্ত

কণ্ঠে স্বীকৃত। প্রাচীন হিন্দু সমাজে যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহা যম স্মৃতির নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে উত্তমরূপে প্রতিধ্বনিত।—

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥

অনুবাদ—প্রাচীন কালে কুমারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপবীত-ধারণ হইত। তাহারা সাবিত্রী (গায়ত্রী) মন্ত্র জপ এবং বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপনা করিত।

সুতাং প্রাচীন কালে কুমারীরা বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দুইই করিত। প্রাচীন সাহিত্য পাঠে জানা যায়, পুরুষদের ন্যায় মহিলারাও বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিযুক্তা হইতেন। রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডে আছে, কৌশল্যা একাকিনী স্বস্তি যাগ অনুষ্ঠান করেন। উল্লিখিত মহাকাব্যের দ্বিতীয় ও পঞ্চম কাণ্ডে লিখিত আছে যে, সীতা পুরুষের ন্যায় প্রাতঃকৃত্য ও সান্ধ্যকৃত্যাদি নিত্যকর্ম অভ্যাস করিয়াছেন। এমন কি, জৈমিনিও বাদরায়ণের বাকোদ্ধৃতি-পূর্বক দেখাইয়াছেন, বৈদিক অনুষ্ঠানে পুরুষের ন্যায় নারীর সমান অধিকার ছিল। উক্ত স্বীকৃতি দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হয়, তাহারা পুরুষদের ন্যায় বেদপাঠ করিতেন এবং উপবীত হইতেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক ডাঃ আস্‌টেকর তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইংরাজি গ্রন্থ "হিন্দু সভ্যতায় নারী"তে সত্যই মন্তব্য করেন, "প্রায় খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ভারতে মহিলারা এই ধর্মীয় সুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ পরিবর্তন আসিতে লাগিল। সায়নাচার্য্য পরাশর সংহিতার যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহাতে উদ্ধৃত হারিত সংহিতার শ্লোকাবলীতে (২০।২৩) পাওয়া যায়, উপনয়নান্তে কয়েকজন ব্রহ্মবাদিনী গভীরভাবে বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সদ্যবধুরা বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। অনেকের মতে হারিত সংহিতার উৎপত্তিকাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক। সুতরাং উক্ত প্রথা অতি প্রাচীন। ব্রহ্মবাদীরা অবিবাহিত থাকিতেন এবং সাধু জীবন যাপন করিতেন। কয়েক শতক পরে মনু সংহিতা (২।৬৫) বেদমন্ত্র উচ্চারণ ব্যতীত নারীর

পক্ষে উপনয়ন অনুষ্ঠান বিধান দিলেন। আরো পরবর্তী কালে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ স্মৃতিকারগণ অধিকতর সহজ সরল অথচ দোষনীয় পন্থা অনুসরণ করিলেন। তাহারা নারী জাতিকে উক্ত অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত রাখিলেন। এই সম্পর্কে ইহা জ্ঞাতব্য যে, প্রাচীন বৈদিক আর্য্যদের এক শাখা পাশাদের মধ্যে উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত। পাশারা ধর্মগুরু জোরোয়াস্তারের মতানুবর্তী হইয়া এখনো এই বৈদিক প্রথা বর্জন করেন নাই।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী নাম সুবিদিত এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত গার্গী; মহাভারতোক্ত সুলভা, রামায়ণোক্ত শবরী প্রমুখ চিরকুমারীদের নাম উল্লেখযোগ্য। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ এমন কি বিবাহিত জীবনেও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের বিধান দিয়াছেন। পরিণীতা দম্পতীর পক্ষে নারী গর্ভবতী না হওয়া পর্য্যন্ত ঋতুকালের পরে প্রত্যেক মাসে একবার মাত্র যৌন সম্ভোগ বিহিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "দুই একটি সন্তান লাভের পর বিবাহিত দম্পতী ভাই-বোনের মত থাকিবেন।" বর্তমান জগৎসমক্ষে তিনি দেখাইয়াছেন, বিবাহিত জীবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্ভব। তৎশিষ্য গৃহী সাধু দুর্গাচরণ নাগ এবং সন্ন্যাসী মহাপুরুষ শিবানন্দ প্রভৃতি উক্ত আদর্শের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই আদর্শ প্রদর্শনার্থ ই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বিবাহ সংস্কার বরণ করিলেন। তাঁহার পরিণীতা পত্নী সারদামণি দেবী যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোমার কি মনে হয়?" তদুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'যে মা মন্দিরে বিরাজিতা, যে মা এই দেহের জন্ম দিয়াছেন, তোমার মধ্যে তাঁকেই দেখ্‌ছি। তোমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বার জীবন্ত প্রতিমারূপে দেখি।" বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন, "ন বা অরে মৈত্রেয়ি, পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।" অর্থাৎ অরে মৈত্রেয়ি, পতির জন্য পতি পত্নীর প্রিয় হয় না। যে পরমাত্মা পতি ও পত্নী

উভয়ের অন্তরে সমভাবে বিরাজিত তাঁহার জন্যই পতি পত্নীর বা পত্নী পতির প্রিয় হয়। দাম্পত্য প্রীতির এই নিগূঢ় তত্ত্ব অবগতি ব্যতীত দৈহিক সম্পর্ক অতিক্রম করা যায় না।

হিন্দু ঋষিদের মতে পরিণয় একটী পুণ্য অনুষ্ঠান। সুতরাং দুই একটী সন্তানের জনক বা জননী হওয়াই শাস্ত্রবিধি। সেই জন্য শাস্ত্রমতে প্রথম সন্তান ধর্মজ এবং পরবর্তী সন্তানগুলি কামজ। ভগবান মনু বলেন, "যে সন্তান বংশগৌরব বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা ও তপস্যার ফলে জাত হয় সে আর্য্য এবং অন্যান্য সন্তান অনার্য্য।" ইউরোপীয় ইতিহাসে ঐরূপ প্রচেষ্টার স্মরণীয় উদাহরণ পামাইবার রাণী ইজনোবিয়া। তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্য ও শক্তির জন্য সমভাবে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অমর ঐতিহাসিক গিবন মন্তব্য করিয়াছেন, "বংশরক্ষার্থ সন্তান লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত তিনি কখনো তাঁহার পতির সহিত আলিঙ্গন গ্রহণ করেন নাই। যদি তাঁহার আকাঙ্খা ব্যর্থ হইত তবে পরবর্তী মাসে পুনরায় একই পরীক্ষাই তিনি অগ্রসর হইতেন এবং অচিরে সাফল্য লাভ করিতেন।" আধুনিক ভারতীয় হিন্দুসমাজে চির কুমারীর সংখ্যা নগণ্য বলিলেই চলে। এখানে ওখানে যে অল্প কয়েক জন আছেন তাহারা দেশের সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তারে অক্ষম। কিন্তু ইউরোপে বা আমেরিকায় শত শত নারী চির কৌমার্য্য সাধারণ ধর্মরূপে দাবী করিয়া থাকেন। মন্টেগাজার মতে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষিত হওয়া মানুষের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। ফেরে মন্তব্য করেন, "যাহারা ভাব-শুদ্ধি সংরক্ষণে সমর্থ তাঁহারাই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণের যোগ্য।" মিরাচী বলেন, "চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিবেচনায় লোকে ধর্মীয় সংযমকে যত কষ্টকর মনে করেন তদপেক্ষা ইহা শতগুণে স্বাভাবিক।" সর্ব কালে ও সর্বদেশে অগণ্য নরনারী দেখা যায়, যাহারা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রীক পাইথাগোরাস-পন্থী, ইহুদী ও এসেনিদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতীর সংখ্যা অল্প নহে।

—আট—

প্রজননে শক্তিক্ষয়

আমেরিকার চিকাগো শহর হইতে একটি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা বহু পূর্বে প্রকাশিত হইত। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উক্ত মাসিকে উইলিয়াম লফ্‌টাস হেয়ার প্রজনন ও পুনর্জীবন সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি ব্রহ্মচর্য্যের দৈহিক প্রয়োজন সম্বন্ধে বিশ্বাস-যোগ্য যুক্তি দিয়াছিলেন। তিনি নির্দেশ দেন যে দেহের অবিভক্ত জীব-কোষগুলি যুগপৎ দুইটি কার্য্য সম্পন্ন করে—শরীর গঠনার্থ আভ্যন্তরীণ পুনর্জীবন এবং বংশরক্ষার্থ বাহ্যিক প্রজনন। প্রাণীবিজ্ঞানের আলোকে তিনি ঘটনাদি উল্লেখপূর্বক প্রমাণ করিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সঞ্জীবনী শক্তিলাভ স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয় ও প্রাথমিক। জীবকোষের আধিক্য হেতু প্রজননী শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং ইহা মাধ্যমিক। এই দুই শক্তি ঘনিষ্ঠভাবে পুষ্টির উপর নির্ভর করে এবং যদি পুষ্টি অল্প হয় তাহা হইলে উভয়শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অনন্তর হেয়ার সাহেব বলেন, "এই ভূমিতে জীবকোষগুলিকে সঞ্জীবিত রাখাই প্রাথমিক জীবন-নীতি এবং প্রজননকে অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর নীতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুষ্টির অল্পতা আধুনিক নরনারীর জীবনে অতি ব্যাপক। সুতরাং পুনর্জীবনকে প্রাথমিক স্থান দেওয়া এবং প্রজননকে স্থগিত রাখা একান্ত কর্তব্য। এই রূপে আমরা জননেন্দ্রিয়ের সংযম শিক্ষা করিতে পারিব এবং পরিশেষে ধীরে ধীরে চিরকৌমার্যে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যে উপনীত হইব। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বিনিময়েও আভ্যন্তরীণ প্রজনন বন্ধ রাখা যায় না। গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমিক বৃদ্ধির প্রত্যেক মুহূর্তে পুনর্জীবনের এই বর্ধমান

শক্তি প্রকটিত হয়। যদি পুনর্জীবন বা পুনর্গঠন বিরত থাকে বা অপূর্ণভাবে চলে তাহা হইলে অকাল বার্ধক্য, দুরারোগ্য ব্যাধি বা প্রাণহানি ঘটে।"

প্রজননের প্রকৃত নাম অকাল মৃত্যু। যৌন মৈথুন মূলতঃ পুরুষের পক্ষে ক্ষয়কর এবং গর্ভধারণের পরে নারীর পক্ষেও ইহা প্রাণহর। সেইজন্য উক্ত চিন্তাশীল লেখক দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন যে, দৈহিক সামর্থ্য, জীবনীশক্তি এবং রোগ-রাহিত্য ব্রহ্মচারী ব্যক্তিগণের ভাগ্যে স্বতঃই উপস্থিত হয়। ইহার প্রমাণস্বরূপ একটি অপ্রীতিকর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিগণের দেহে কৃত্রিম উপায়ে শুক্র ইন্‌জেক্‌সান দিয়া বহু কঠিন রোগ আরোগ্য করা হইয়াছে ও হইতেছে। প্যাট্রিক গেডিস 'যৌন বিকাশ' নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"পুনর্জনন ও অকালমৃত্যু বাস্তবপক্ষে সাধারণতঃ একার্থক হইলেও প্রচলিত ভাষায় ইহা ভিন্নভাবে কথিত হয়। ইতিহাসের আলোকে বলিলে বলিতে হয়, মরিতে হইবে বলিয়া পশুরা প্রজনন করে ইহা সত্য নহে। কিন্তু তাহারা প্রজনন করে বলিয়াই শীঘ্র মরে।" জার্মান মনীষী গ্যেটের বাক্য উক্ত মত সমর্থনে উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্যেটে বলেন, মৃত্যু প্রজননকে সূচিত করে না ; কিন্তু মৃত্যুই প্রজননের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। শরীর তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা যায়, দৈহিক সৃষ্টি বন্ধ হইলে পরমার্থিক সৃষ্টি বা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আরম্ভ হয়।

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণিগণ কর্তৃকও ব্রহ্মচর্য পালিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, গৃহপালিত গবাদি পশুরা মানুষ অপেক্ষা অধিকতর সংযত। সামান্য পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই ঘটনা গৃহে গৃহে লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ এই যে, সহজাত প্রবৃত্তির বশে জিহ্বার উপর গবাদি পশুর সম্যক্ সংযম আছে। কিন্তু সেই সংযম সহজাত, স্বেচ্ছাকৃত নয়। তাহারা ঘাস-খড় খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে এবং এই খাদ্যও তাহারা ততটুকু খায় যতটুকু ক্ষুন্নিবৃত্তি বা দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন। লাটিন লেখক জে. বিবার্গ বলেন, "জন্তুজগতে জননেন্দ্রিয় অধিকাংশ দেহে প্রকৃতির দ্বারা সুগুপ্ত, যেন তাহারা

ইহা কাহাকেও দেখাইতে লজ্জাবোধ করে!" একদা সীমান্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব দেশনায়ক আবদুল গফর খান মহাত্মা গান্ধীর নিকট এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বস্তুতঃ উপজাতির নিকট ব্রহ্মচর্য পালন অতিশয় স্বাভাবিক। বিবাহের বাহিরে তাহারা যৌন সংযমে অভ্যস্ত। তাহাদের সুবিদিত কষ্টসহিষ্ণুতা ও শক্তিসামর্থ্যের কৌশল প্রধানতঃ তাহাদের সংযত জীবনে, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অবস্থানে এবং মুক্তবায়ুতে জীবনযাপনে। উপজাতির নরনারীরা পূর্ণ বয়সে পরিণীত হয়। তাহাদের মধ্যে অবিশ্বস্ততা, ব্যভিচার, বা অবৈধ প্রেম অজ্ঞাত বলিলেই চলে। তাহাদের নিকট বিহিত পরিধির বাহিরে যৌন মিলনের শাস্তি মৃত্যু। অন্যায়কারীর প্রাণ-হত্যা করিবার অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সর্বদাই থাকে।

সর্বশাস্ত্র, মহাপুরুষগণ এমনকি আধুনিক সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সকলেই ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্য সংরক্ষণের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন এবং সুন্দর স্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন ও অপার আনন্দ লাভের উপায় রূপে প্রচার করিয়াছেন।

—নয়—

মার্টিনলুথারের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্বেষ

সব ধর্মগুরুর মধ্যে একমাত্র মার্টিন লুথারই ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বলিতেন, "যদি ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভব হয় তবে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ ত্যাগ করাও যায়।" লুথার ছিলেন প্রোটেষ্ট্যান্ট (প্রতিবাদী) খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং গির্জানুমোদিত বাধ্যতামূলক কৌমার্য বা ব্রহ্মচর্যের চির-শত্রু। সেইজন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তিনি নর-নারী উভয়ের পক্ষেই বহু বিবাহ প্রথা প্রচলনে অগ্রণী হন। প্রসিদ্ধ ধর্মসমূহের মধ্যে কেবল প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মমতই ত্যাগ, তপস্যা ও সংযমের প্রতি বিদ্বেষ ঘোষণা করিয়াছেন। লুথারের এই বিদ্বেষ সম্বন্ধে জার্মাণ দার্শনিক সোপেনহাওয়ার মন্তব্য করেন, "ইহা দার্শনিক মতের মূলনীতিগুলির সহিত সম্পূর্ণ অসমঞ্জস্য।" উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানধর্ম্ম উহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবে, নচেৎ জনপ্রিয়তা হ্রাস এবং পরিশেষে অবলুপ্ত হইবে।

মানব প্রকৃতির সুগভীর বিশ্লেষক কয়েরষ্টার বলেন, "মানব সমাজই জগৎ অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্মভিত্তি চাহিয়াছিল। যেরূপ অভ্যাস ইহার স্বাভাবিক ও সাধারণ জীবনের সমভূমির অতিশয় নিকটবর্তী তাহার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নাই। সকল ধর্ম্মগুরুগণ তৎতৎ পদানুগ বিশ্বাসীদের সম্মুখে কঠোর আদর্শ ও নিম্নতর প্রকৃতি বিজয় রাখিয়াছেন। আত্মমুক্তির উদ্দেশ্যে পাশব প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে উঠিতে মানুষকে তাঁহারা যতটুকু সাহায্য করিয়াছেন ততটুকুই তাঁহারা মানবমনকে পরাস্ত, তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তিকে প্রভাবিত এবং তাহাদের হৃদয়কে উদারভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।"

যতদিন রোমীয় ধর্ম জীবন্ত ও জাগ্রত ছিল ততদিনই উহা সাধক-সাধিকাদের জীবন দিব্য দীপ্তিতে মণ্ডিত করিত। তৎকালে রোমীয়

সাধক-সাধিকাদিগের পবিত্রতা দেবতাদিগকেও পরিতৃপ্ত করিত। মার্কিণ যুক্তরাজ্য ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট গির্জাসমূহের মধ্যে বিগত শতকে ধর্ম সংস্কারের যে সকল প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহাতে চির কৌমার্যের বা ব্রহ্মচর্যের ধর্মমূল্যের ক্রমবর্ধমান প্রশংসা দেখা যায়। ক্যাথলিক গির্জা জন্মকাল হইতেই কৌমার্যকে ধর্মজীবনে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছে এবং উহার ভক্তগণকে চির কৌমার্যের সামাজিক মূল্য দিতে শিক্ষা দিয়াছে। মানব জাতির ধর্মগুরুদের ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে, ধর্মোন্নতির পক্ষে যৌন সংযম সম্যক্ প্রয়োজন। অধ্যাত্ম সাধনায় মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর যে ক্লান্তি হয় তাহা সহ্য করিতে হইলে বিপুল স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রয়োজন হয়। ইহা বীর্যধারণ ব্যতীত অন্য উপায়ে লভ্য নহে। দেহের স্বাস্থ্য ও মনের স্থৈর্য্য লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য রক্ষা অবশ্যই কর্তব্য। সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসিলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মে। এতদ্ব্যতীত পরমার্থ সত্যের উচ্চতর অভিব্যক্তি অনুভবার্থ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল স্নায়ু সক্রিয় হয়। বীর্যধারণ না করিলে স্নায়ুমণ্ডলী বিশুষ্ক, দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়।

ছাত্রছাত্রীগণ, স্বাস্থ্যান্বেষীগণ, এমনকি বিবাহিত যুবক যুবতীগণ বীর্য ধারণকে জীবনের মূলভিত্তি না করিলে স্বাস্থ্য, আয়ু, সুখ প্রভৃতি লাভ করিতে পারিবে না।

অব্রহ্মচারীর পক্ষে উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ অসম্ভব। সেইজন্যই জগতের সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় কর্তৃক ব্রহ্মচর্য কোন না কোন আকারে অধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তিরূপে স্বীকৃত।

—দশ—

শরীর বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের আলোকে ব্রহ্মচর্য্য

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুসারে সুস্থ সবল যৌন গ্রন্থি দ্বারাই দৈহিক শক্তি ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। যখন এই সকল গ্রন্থি সম্যকরূপে ক্রিয়াশীল থাকে তখন সেইগুলি হইতে যে আভ্যন্তর রস নিঃসৃত হয় তাহাই সজীব তন্তু, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক-কোষ ও মেরুদণ্ডকে সঞ্জীবিত ও শক্তিশালী করে। চির কুমার ব্রহ্মচারীর জীবন প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রমাণিত করে যে, বীর্যধারণ দ্বারাই এই সকল গ্রন্থি স্বাস্থ্যবান ও সক্রিয় থাকে। মার্কিণ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের অগ্রনায়ক মার্গারেট স্যাঙ্গার এবং প্রসিদ্ধ মার্কিন চিকিৎসক ডাঃ ম্যাক্‌সাটন বোম্বাইয়ের শ্রীযোগেন্দ্রের সহিত যোগ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনান্তে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, যদি সহজসাধ্য হয় তবে বীর্যধারণের যৌগিক প্রণালীই সর্ব প্রকার জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সম্যক্‌ সমাধান প্রদানে সমর্থ।

১৯২২ খ্রীঃ লণ্ডনে আন্তর্জাতিক জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মহাসভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে বিভিন্ন দেশের ১৬৪ জন প্রসিদ্ধ ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। উহার গর্ভ-নিরোধ প্রণালী শাখায় মাত্র তিনজন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ডাক্তার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উৎকৃষ্ট গর্ভ-নিরোধ প্রণালীর দ্বারা যে বন্ধ্যাত্ব বা স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না তাহার বিরুদ্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নাই। যে তিন জন যৌন ভাবসমর্থক ডাক্তার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন নাই তাহাদের সংকীর্ণ মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়াছে। মার্কিণ সামাজিক স্বাস্থ্য সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকের মতে যৌন সংযম স্বাস্থ্যকর ও উপকারী। ডাঃ আলেক্‌সিস

ক্যারেল বলেন, যাহারা ইতোমধ্যে অব্যবস্থিতচিত্ত এবং কামাদি রিপুকে স্বেচ্ছায় প্রশ্রয় দেন তাহারা ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট যৌন সংযম অনিষ্টকর নহে। মহাত্মা গান্ধী সত্যই বলেন, "ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে যৌন ক্রিয়া মানবের পশুত্ব-প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং নিজেকে ইহার ঊর্দ্ধে উত্থাপনই মানুষের প্রথম কর্তব্য।" মানুষ মৈথুনত্যাগে যতটুকু সমর্থ ততটুকুই সে পশু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ পশু মৈথুন ত্যাগে সম্পূর্ণ অসমর্থ। গর্ভ-নিরোধের কোন কোন পক্ষপাতি ব্যক্তি মনে করেন যে বিমূঢ় ও উন্মত্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট যৌন প্রশ্রয় জীবনের মূল নীতি হইতে পারে না।

কামাদি রিপু উপভোগের দ্বারা কখনো নিবৃত্ত হয় না। ইংরাজ মনীষী সি. ই. এম. জোয়াড সত্যই বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়-সুখকে যদি তোমার জীবনের চরম লক্ষ্য কর, এমন সময় আসিবে যখন আর কোনো কিছুই তোমাকে তৃপ্ত করিবে না।" মহাভারতের আদি পর্বে (৭৩ অধ্যায়ে) বর্ণিত আছে রাজা যযাতি স্বপুত্র পুরুর যৌবন লইয়া প্রায় এক হাজার বৎসর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করেন এবং অবশেষে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনুভব করেন যে, তাঁহার ভোগেচ্ছা বিন্দুমাত্রও পরিতৃপ্ত হয় নাই, বরং ইহা দাবাগ্নির মত শত গুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি তৎপুত্রকে বলিলেন—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥
> যৎপৃথিব্যাং ব্রীহির্যবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
> একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥

অনুবাদ—কদাপি কামীদের কামনা উপভোগ দ্বারা প্রশমিত হয় না। ঘৃত দ্বারা যেমন অগ্নি পুনরায় বর্ধিত হয় তেমনি কাম রিপু ভোগ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রত্নপূর্ণা পৃথিবীতে যত ব্রীহি ও যবাদি শস্য, স্বর্ণ পশু ও স্ত্রী আছে তাহারা এক জনের ভোগের জন্যও পর্য্যাপ্ত নহে। কামনার শেষ নাই বলিয়া ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ কর এবং শমগুণ অবলম্বন কর।

পঞ্চতন্ত্রে আছে—

জীর্য্যন্তে জীর্যতঃ কেশাঃ দন্তাঃ জীর্যন্তি জীর্যতঃ।
জীর্যতশ্চক্ষুষী শ্রোত্রে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে॥

অনুবাদ—জীর্ণ কেশরাশি আরও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জীর্ণ দন্তপংক্তি আরও জীর্ণ হয় এবং জীর্ণ চক্ষু ও কর্ণ সমুদয় অধিকতর জীর্ণ হইতে থাকে। কিন্তু একমাত্র বিষয়-তৃষ্ণাই চিরতরুণ থাকিয়া যায়।

মহাত্মা গান্ধী বলেন, গর্ভনিরোধ প্রণালী দ্বারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ জাতীয় আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধের চেষ্টা গোহত্যার পরিবর্তে জুতা দান করার তুল্য। উহা দ্বারা নরনারী উচ্ছৃঙ্খল হয়। ইন্দ্রিয় সংযমই জন্মহার হ্রাসের একমাত্র সুনিশ্চিত উপায়। কারণ ইহা ব্যক্তি ও সমষ্টির পক্ষে শ্রেয়তর। মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেন, আলস্য, খিট্‌খিটে মেজাজ, সন্ন্যাসরোগ অকাল বার্ধক্য এবং এমন কি, উন্মত্ততার অধিকাংশ কারণ ব্রহ্মচর্যের অভাব। ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্মচর্যকে কেহ কেহ উহাদের কারণ বলিয়া অনুমান করেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষিত প্রমাণ অখণ্ড ব্রহ্মচর্য বিরোধী। পশুভাবাপন্ন নরনারীদিগকে ব্রহ্মচর্য্যপালনে যখন বাধ্য করা হয় তখনই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রে সত্য হয়। তদ্রূপ জৈবপ্রবণতাবিশিষ্ট মানুষ যৌন প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধনে অসমর্থ হয়। সেই জন্য তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলী বিষাক্ত এবং যৌন গ্রন্থি জরাগ্রস্ত হয়। ইহার ফলে. কাহারও অকাল বার্ধক্যও ঘটে। ইহাও সত্য যে, বিবাহিত জীবনে সংযম থাকিলে দীর্ঘ জীবন ও নীরোগ স্বাস্থ্য লাভ হয়। নিঃসন্দেহে ইহাই অধিকাংশের পক্ষে উপযোগী। এমন কতকগুলি যৌগিক প্রক্রিয়া আছে যেগুলি অভ্যাস করিলে যৌন গ্রন্থিগুলির নিঃসৃত রস সঞ্চিত না হইয়া রক্তে মিশ্রিত হয় এবং এইরূপে তথা-কথিত অনিষ্ট দূরীভূত হয়। বোম্বাইর স্বামী কুবলয়ানন্দ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, সিদ্ধাসন, সর্ব্বাঙ্গাসন, গোরক্ষাসন প্রভৃতি যৌগিক ব্যায়াম দ্বারা

উক্ত কার্য সম্যক্ রূপে সম্পন্ন হয়।* সমাজের অন্ততঃ মুষ্টিমেয় নরনারী যৌনবেগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। স্পষ্টতঃ তাহারা অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের সুযোগ্য অধিকারী এবং তাহারাই ব্রহ্মচর্যের সৃজনী শক্তির প্রভাব অনুভব করেন। মনোবিশ্লেষণের ভাষায় কামভাবের রূপান্তর সাধনই ব্রহ্মচর্যের বিচার্য বিষয়। নানা দেশের ধর্মপন্থীগণ কামদমনের শত শত কার্য্যকরী সরল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সমাজের সংখ্যালঘু অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত অধিকাংশ নরনারীই স্বীকার করেন, আমরা যতই বীর্যধারণ করি ততই আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল হয়। যতই আমরা যৌন চিন্তাকে প্রশ্রয় দিই ততই আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য ধ্বংসপথে চালিত হয়।

যাহার কখনও বীর্য্যক্ষয় হয়নি, এমনকি স্বপ্নেও শুক্র ক্ষয়নি, তিনিই উর্দ্ধরেতা, যেমন শুকদেবাদি। পূর্বে শুক্রক্ষয় হয়েছে, তারপর বীর্য্যধারণ, তাকে বলে ধৈর্য্যরেতা। বার বৎসর ধৈর্য্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরের মেধা নাড়ী নামে একটি নূতন নাড়ী খুলে যায়, তখন তার সব স্মরণ থাকে ও সব ধারণা করতে পারে। —শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

*মৎ প্রণীত সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

———

—এগার—

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত

ঋষি পতঞ্জলি বলেন, "বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্যম্।" ইহার অর্থ বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মলাভার্থ যে সব চর্য্যা অনুষ্ঠেয় তন্মধ্যে অন্যতমকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। বীর্য্যধারণ ও যৌন শক্তিক্ষয় নিবারণই ব্রহ্মচর্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

কর্মণা মনসা বাচা সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
সর্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্যং প্রচক্ষ্যতে ॥

অনুবাদ—কর্ম্মে, মনে ও বাক্যে সকল অবস্থায় সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে মৈথুন ত্যাগকেই ব্রহ্মচর্য বলে। মৈথুন শব্দের অর্থ যৌন সম্ভোগ।

ডাঃ লুইস বলেন, সকল প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ একমত যে, রক্তের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ কণিকাসমূহ শুক্রসৃজনে কার্যকরী হয়। দৈহিক সামর্থ্য, মানসিক শক্তি এবং বুদ্ধির প্রাখর্য সংরক্ষণে শুক্রসঞ্চয় অশেষ উপকারী।

ডাঃ ই. পি. মিলার লিখিয়াছেন, স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সর্ব্বপ্রকার শুক্রক্ষয়ে জীবনী শক্তির প্রত্যক্ষ অপচয় হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও ডাঃ লুইসের অভিমত সমর্থিত। চরক ও সুশ্রুত প্রমুখ আয়ুর্ব্বেদাচার্যগণ বলেন, রক্তের সারভাগই শুক্রে পরিণত হয়। আয়ুর্ব্বেদ-মতে মানবদেহ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্ত ধাতুতে গঠিত। উক্ত শাস্ত্রে আছে—

এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যন্নৃণাম্।
রসাসৃঙ-মাংস মেদোঽস্থি মজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ ॥

অনুবাদ—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্ত ধাতু মানব দেহে অবস্থিত হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করে। ঋষি সুশ্রুত বলেন—

রসাৎ রক্তম্ ততো মাংসাৎ মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্ত সম্ভবঃ॥

অনুবাদ—আমরা যে খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ করি তাহা পরিপাক হইয়া পাকস্থলীতে রসে পরিণত হয়। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়।

সুতরাং শুক্রই সূক্ষ্মতম ধাতু এবং মানব দেহের সার পদার্থ। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বলেন, আমরা যে খাদ্য আহার করি তাহা পরিপাক হইয়া পাঁচ দিন পরে রসে পরিণত হয়। রস পাঁচ দিন পরে রক্তে, রক্ত পাঁচ দিন পরে মাংসে, মাংস পাঁচ দিন পরে মেদে, এবং মেদ পাঁচ দিন পরে শুক্রে পরিণত হয়। অতএব ভুক্ত দ্রব্য সাধারণতঃ পরিপাক হইবার পর শুক্রে পরিণত হইতে পঁয়ত্রিশ দিন সময় লাগে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে ষাট ফোঁটা রক্ত হইতে এক ফোঁটা শুক্র উৎপন্ন হয়। সর্বোত্তম ধাতু শুক্রের প্রশংসা হিন্দু শাস্ত্র এই ভাবে কীর্তন করিয়াছেন—

শুক্রং সৌমং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবনাশ্রয়ো উত্তমঃ॥

অনুবাদ—শুক্র সৌম্য, শুভ্র, স্নিগ্ধ, বলবর্ধক ও পুষ্টিকর বলিয়া কথিত। ইহা গর্ভবীজ, দেহসার ও জীবনী শক্তির মূল ভিত্তি।

যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষু-রসে যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্॥

অনুবাদ—যেমন দুগ্ধে ঘৃত এবং ইক্ষুরসে গুড় সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে তেমনি মানব দেহের সর্ব্বত্র শুক্র পরিব্যাপ্ত আছে।

মানবদেহে যে দুইটি অণ্ডকোষ লিঙ্গমূলে সংলগ্ন আছে সেইগুলিকে শুক্রজনক গ্রন্থি বলে। অণ্ডকোষদ্বয়ে এমন কতকগুলি জীবকোষ অবস্থিত যাহা রক্ত হইতে শুক্র উৎপাদন করিতে সমর্থ। ঠিক যেমন মৌমাছিরা বিভিন্ন ফুল হইতে বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহ করিয়া মৌচাকে রাখে তেমনি অণ্ডকোষের জীবকোষগুলি দেহস্থ রক্ত হইতে বিন্দু বিন্দু শুক্র সঞ্চয় করে। শুক্র থলি হইতে দুইটী নল দ্বারা শুক্র মূত্রনালীতে নির্গত হয়। কামোত্তেজনার সময় শুক্রবাহী নালীর দ্বার উন্মুক্ত হয়, অন্য সময় উহা বন্ধ থাকে। উত্তেজিত অবস্থায় বিন্দু বিন্দু শুক্র মূত্রনালী দিয়া বহির্গত হয়। স্বপ্নদোষকালেও এইভাবে শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে। পুরুষ-দেহে শুক্রসৃষ্টি দীর্ঘকাল চলে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত। ব্রহ্মচারীদের দেহে তদধিক কাল শুক্র সৃষ্ট হইয়া থাকে। শুক্র রক্তে পুনর্মিশ্রিত না হইলে বহির্গত হইয়া যায়। শুক্রকে রক্তে মিশ্রিত করাই ব্রহ্মচারীর প্রধান সমস্যা। এই সার বস্তুকে রক্তে মিশ্রিত করিতে পারিলেই উহার সুষ্ঠ সদ্ব্যবহার হয়, নচেৎ উহার অপচয় অবশ্যম্ভাবী।

অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্ত তাহার "ছাত্র জীবন" নামক পুস্তকে নিম্নোক্ত প্রকার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন, কিরূপে শুক্র উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়। অণ্ডকোষদ্বয়ে রক্ত-প্রবাহ অতি মন্থর বলিয়া উহাতে রক্তের বহু সার পদার্থ সঞ্চিত এবং শুক্রে পরিণত হয়। প্রত্যেক অণ্ডকোষে অনেক গুলি সরু নল আছে। সেগুলি মিলিত হইয়া একটি বড় নল সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই শুক্রবাহী নল। ইহা সুদীর্ঘ, ও মলদ্বার হইতে তলপেট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং অবশেষে মূত্রনালীতে প্রবিষ্ট। মূত্রনালীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে ইহা বিস্তৃত হইয়া একটি বড় থলীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাকে শুক্রথলী বলে। ইহা মলদ্বার ও মূত্রাশয়ের অতি নিকটে অবস্থিত। মূত্রাশয়ের সহিত সংযুক্ত হইবার পূর্বে ইহা অত্যন্ত সরু হইয়া গিয়াছে। ইহা রবারের মত সংকোচন ও প্রসারণে সমর্থ। স্বভাবতঃই ইহা সংকুচিত থাকে এবং শুক্রকে বহির্গত হইতে দেয় না। শুক্রথলীর কোষগুলি সংকুচিত হইলে বড় নলের

অন্ত ভাগ বিস্তৃত হয় এবং বড় নলের অন্ত ভাগ সংকুচিত হইলে শুক্রথলীর কোষগুলি বিস্তৃত থাকে। বড় নলের অন্ত ভাগ যতই শক্ত থাকে ততই শুক্রক্ষয় কম হয়। অণ্ডকোষে শুক্র সর্বদা বিন্দু বিন্দু উৎপন্ন হইয়া বড় নল দিয়া যাইয়া শুক্রথলীতে সঞ্চিত হয়। কিন্তু মূত্রাশয় বড় নলের অন্ত ভাগের দিকে বন্ধ থাকায় শুক্র মূত্রাশয়ে যাইতে পারে না। কামবেগ আসিলে বা উত্তেজনা হইলে শুক্র অণ্ডকোষ হইতে শুক্র-থলীতে না যাইয়া বড় নল দিয়া মূত্রনালীতে উপস্থিত হয়। যখন বহির্গমনের প্রয়োজন না থাকে তখন ইহা শুক্র-থলিতে সঞ্চিত হয়। শুক্র-থলী পরিপূর্ণ হইলে ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া শুক্র-কণা রক্তে মিশ্রিত হয়। তখন ইহা রক্তের শ্বেত কণিকাতুল্য দেখায়। কিন্তু সেগুলি এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও সেগুলিকে রক্তে পৃথক্ ভাবে দেখা যায় না। রক্তের শ্বেত কণিকাতুল্য সেগুলি ব্যাধি প্রতিরোধ এবং ক্ষত, কাটা ও মোচড়ান স্থান আরোগ্য এবং নূতন মাংস সৃষ্টি করিতে সমর্থ। সেইজন্ত যিনি যতই উক্ত ধাতু রক্তে রক্ষা করিতে পারেন তিনি ততই ব্যাধি-মুক্ত থাকেন। এই কারণেই ব্রহ্মচারী সহজে ব্যাধিগ্রস্ত হন না এবং রোগাক্রান্ত হইলেও অব্রহ্মচারী অপেক্ষা সহজে রোগমুক্ত হন। রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার পর শুক্র পুনরায় অণ্ডকোষে ফিরিয়া যায় এবং অন্ত উপাদন সহযোগে শ্রেষ্ঠতর ও গাঢ়তর আকার ধারণ করে। এই নূতন পদার্থ বড় নলের মধ্য দিয়া পুনরায় শুক্রথলীতে যায়। যথা সময়ে উহা পুনরায় রক্তে মিশ্রিত হইয়া রক্তকে শক্তিশালী করে। পুনরায় ইহা অণ্ডকোষে প্রবাহিত এবং আরো গাঢ় ও শুদ্ধ শুক্রে পরিণত হয়। শুক্রক্ষয় না হইলে ইহা ক্রমশঃ দেহ এবং মনকে সবল ও সুস্থ করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলে শুক্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেঙাচিতুল্য অসংখ্য প্রোটোপ্ল্যাজম্ কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখা যায়। উক্ত কোষগুলি এ্যালবুমেন ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। এই এ্যালবুমেন ব্যতীত স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল হইয়া পড়ে। যাহাকে কামোদ্ভূত উত্তেজনা বলা হয় তাহা এই স্নায়ুমণ্ডলীর বিক্ষোভ মাত্র। সুতরাং এমন চিন্তা

বা এমন কাজ করা উচিত নয়, যাহা স্নায়ুমণ্ডলীকে অস্বাভাবিক প্রকারে উত্তেজিত করিতে পারে।

মূত্রাশয়, মলভাণ্ড ও শুক্রথলী পাশাপাশি অবস্থিত। মল, মূত্র বা উদরস্থ বায়ুর বেগ ধারণ করিলে যে উত্তাপ সৃষ্ট হয় তাহা শুক্রথলীকে উত্তপ্ত করে। তখন ঘনীভূত শুক্র বরফবৎ বা ঘৃতবৎ তরল হইয়া বহির্গমনার্থ মূত্রনালীতে জমে। এই জন্যই মল মূত্র বা বায়ুর বেগ ধারণ এত অনিষ্টকর। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন ভোজনের দুই তিন ঘণ্টা পরে এবং অপরাহ্নে প্রচুর জলপান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়। বীর্য্য বা শুক্র ধারণ করিলে দেহে অষ্টম ধাতু ওজস্ সৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্যদেশীয়গণ ওজস্‌কেই মানবীয় ম্যাগনেটিজম (আকর্ষণী শক্তি) বলেন। ওজঃই অধ্যাত্ম শক্তির মূল উৎস এবং ব্যক্তিত্বের আসল উপাদান। ভাগবতে আছে—

ওজশ্চ তেজো ধাতুনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্॥
যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টিপুষ্টিবলাদয়ঃ।
যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিংস্তিষ্ঠতি জীবনম্॥
নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবাঃ বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ।
উৎসাহ-প্রতিভা-ধৈর্য্য-লাবণ্য-সুকুমারতাঃ॥

অনুবাদ—রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর তেজকে ওজঃ বলে। সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত হইলেও ইহা প্রধানতঃ হৃদয়েই অবস্থিত। চিত্তের প্রফুল্লতা, দেহের পুষ্টি ও বল ওজোবৃদ্ধির উপরেই সম্যক্ নির্ভর করে। ইহার অস্তিত্বে জীবন এবং ইহার অভাবেই মৃত্যু ঘটে। ইহাই জীবনের প্রধান অবলম্বন। উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য ও সুকুমারতা প্রভৃতি দেহ-গুণ ওজোধাতু হইতে উৎপন্ন হয়।

ঋষি সুশ্রুত বলেন, "রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতুনাং যৎপরং তেজঃ তৎখলু ওজসঃ তদেব বলমিতি।" অর্থাৎ রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে শ্রেষ্ঠ তেজ তাহা ওজঃ সম্ভূত, তাহাই বল। শারঙ্গধর বলেন—

ওজঃ সর্বশরীরস্থং স্নিগ্ধং শীতং স্থিরং সিতং।
সোমাত্মকং শরীরস্থ বলপুষ্টিকরং মতম্॥

অনুবাদ—ওজঃ ধাতু সমগ্র শরীরে পরিব্যপ্ত থাকে। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, স্থির ও চন্দ্রবৎ শুভ্র। দেহের বল ও পুষ্টি সাধনে ইহা অদ্বিতীয়।

ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে শুক্রই মানব দেহের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ধাতু ও সার পদার্থ। সেইজন্য শিবসংহিতা বলেন—

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারনাৎ।
তস্মাৎ অতিপ্রযত্নেন ক্রিয়তাং বিন্দুধারণম্॥

অনুবাদ—বীর্যধারণই জীবন, বীর্য্যক্ষয়ই মৃত্যু। অতএব সর্ব প্রযত্নে বীর্য্যধারণ কল্যাণকর ও কর্ত্তব্য।

গুরু দত্তাত্রেয় বলেন—

যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আত্মক্ষয়ো বিন্দুহানাৎ অসামর্থ্যঞ্চ জায়তে॥

অনুবাদ—নারী পুরুষসঙ্গ বা পুরুষ নারীসঙ্গ করিলে বীর্য্যপাত অবশ্যম্ভাবী। বীর্য্যক্ষয় আত্মহত্যাতুল্য। ইহাতে দেহ-মনের অক্ষমতা ও অথর্বতা জন্মে।

জ্ঞানিগণ সত্যই বলিয়াছেন যে কাম-চিন্তাদি অষ্ট প্রকার মৈথুন নরক-তুল্য এবং ব্রহ্মচর্য্য স্বর্গতুল্য। হিন্দু শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যকে মহাব্রত বা শিরোব্রত বলা হইয়াছে। কারণ, ইহার উপকার যেমন অসীম, ইহাতে পূর্ণতা লাভও তেমনি কষ্টকর। আয়ুর্বেদ-জনক ধন্বন্তরির কোন ছাত্র তাঁহার নিকট সমগ্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যায়নান্তে বিদায় গ্রহণ কালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্ আমাকে স্বাস্থ্যরক্ষার সুকৌশল শিক্ষা দিন।" ধন্বন্তরি সহাস্যে উত্তর দিলেন, "শুক্রই আত্মা। শুক্রধারণই স্বাস্থ্যরক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। যে শুক্রক্ষয় করে তাহার দৈহিক, নৈতিক বা মানসিক অবনতি ঘটে।" 'জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্রে দেবাদিদেব মহাদেব বলেন—

ন তপস্তপঃ ইত্যাহুঃ ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্ধ্বরেতা ভবেৎ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥

অনুবাদ—দৈহিক কৃচ্ছ্রতা বা অন্য কোনও তপস্যা প্রকৃত তপস্যা নহে। ব্রহ্মচর্য্য পালন বা বীর্য্যধারণই উত্তম তপস্যা। যিনি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনে সমর্থ তিনি মানুষ নন, তিনি সাক্ষাৎ দেবতা।

সিদ্ধে বিন্দৌ মহারত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশো ভবেৎ॥

অনুবাদ—শুক্র মহামূল্য রত্নতুল্য। ইহা রক্ষিত হইলে পৃথিবীতে কোন সিদ্ধিই অপ্রাপ্য থাকে না। ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলেই ত্রিভুবনে আমার এতাদৃশী অপার মহিমা লাভ হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই বলিয়াছেন, যে কামচিন্তা বা কামক্রিয়া বর্জন করে তাহার নিকট ত্রিভুবন তুচ্ছ। ঋষি পতঞ্জলি বলেন,"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ। অর্থাৎ বীর্যধারণে সামর্থ্য জন্মিলেই দেহবল ও মনঃশক্তি উভয়ই লাভ হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে অষ্টপ্রকার মৈথুনত্যাগেই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যথা—

শ্রবণং কীর্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যম্ অনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

অনুবাদ—মনীষিগণ বলেন, যৌনবিষয়ক শ্রবণ, কীর্তন, ক্রীড়া, দর্শন, গোপনে আলাপ, সংকল্প, প্রচেষ্টা ও ক্রিয়া—এই আট প্রকার মৈথুন। ইহার বিপরীত অনুষ্ঠানই ব্রহ্মচর্য্য। মুক্তিকামীগণ কর্তৃক ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠেয়। কামচিন্তায় প্রশ্রয় দিলেই ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয়। অব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মানুষ পশু হইয়া যায়। যিশু খ্রীষ্ট সত্যই বলিয়াছেন, "যে কাম-চক্ষে নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে সে মনে মনে ব্যাভিচারই করিয়া থাকে।"

—বার—

দুর্জয় কামশক্তি

কামরিপু কত বলশালী, কামজয় কত কঠিন এবং কামের মূলোচ্ছেদ কত দুঃসাধ্য তাহা নিম্নলিখিত উপাখ্যান হইতে সহজেই অনুমেয়। সর্বদা সতর্ক থাকা সত্ত্বেও কেহ বলিতে পারে না, কখন সে কাম কর্তৃক আক্রান্ত হইবে। তরুণ সাধক-সাধিকাগণ কখনো কামজয় সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া অরক্ষিত থাকিবে না। একদা ব্যাসদেব তাঁহার শিষ্যবৃন্দের নিকট কথা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারীদের পক্ষে নারীসঙ্গ, এমন কি ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গও পরিহার্য্য। ইহাতে তৎশিষ্য পূর্ব মীমাংসা দর্শনকার জৈমিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন "আমি ব্রহ্মচর্য্যে এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কোন লোভনীয় বস্তু, এমন কি কোন সুন্দরী তরুণীও আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না।" ব্যাসদেব তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "কামদমনের পিচ্ছিল পথে নিশ্চিন্ত-হওয়া একেবারে অনুচিত। এই বিষয়ে আরো সতর্ক থাকিও।" কিছু কাল পরে ব্যাসমুনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিলেন যে, তিনি তীর্থভ্রমণে যাইবেন এবং কয়েক মাস পরে ফিরিবেন। তপোবন ত্যাগের অব্যবহিত পরে তিনি এক কমল-নয়না চন্দ্রবদনা সুন্দরী রমণীর মূর্তি ধারণ করিলেন। উক্ত রমণী সন্ধ্যাকালে কোন বৃক্ষতলে একাকিনী দণ্ডায়মানা ছিলেন। হঠাৎ আকাশ ঘন কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই সময় জৈমিনি সেই পথ দিয়া স্বীয় আশ্রমে ফিরিতে ছিলেন। পথে অসহায়া রমণীকে দেখিয়া তৎপ্রতি করুণার্দ্র হইয়া বলিলেন, "প্রিয় ভগিনী, তুমি আমার পার্শ্ববর্তী আশ্রমে যাইয়া আজ রাত্রিবাস করিতে পার।" অনুসন্ধানে যখন তিনি জানিলেন আশ্রমে যাইয়া জৈমিনি একাকীই থাকেন এবং তথায় কোন রমণী নাই তখন

তিনি বলিলেন, "আমার মত তরুণী ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে একাকিনী কোন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে রাত্রিবাস যুক্তিসঙ্গত ও নিরাপদ নয়।" যখন জৈমিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি সুদৃঢ় ভাবে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার নিকট হইতে তরুণীর কোন ভয়ের কারণ নাই, তখন তিনি আশ্রমে যাইতে সম্মত হইলেন। আশ্রমে তরুণী কুটীরের মধ্যে এবং জৈমিনি বাহিরে রাত্রি যাপন করিলেন। গভীর রাত্রে দুর্জয় কাম ছদ্মবেশে জৈমিনির মনে প্রবিষ্ট হইল। ঝড়-বৃষ্টির অছিলায় তিনি কুটীরাভ্যন্তরে যাইয়া শয়ন করিলেন। অবশেষে তিনি কামাসক্ত হইয়া রমণীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে ব্যাসদেব স্বকীয় স্বরূপ পুনঃ প্রকটপূর্বক স্বশিষ্যকে বিস্মিত ও তিরস্কার করিলেন এবং মিথ্যা দম্ভ ও অভিমান ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন।

কামজয় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল যাহারা ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং নিরন্তর সৎসঙ্গ, সচ্চিন্তা ও প্রার্থনায় ব্যাপৃত থাকেন তাঁহারাই উক্ত অসাধ্য সাধনে সমর্থ হন। প্রত্যেক নারীতে মাতৃবুদ্ধি বা নারীকে জগদম্বার অংশজাত মনে করা কামজয়ের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বলিয়াছেন, কাম একটি নরক-দ্বার ; কাম দুর্জয় রিপু এবং কামচিন্তা মানুষকে নিরয়গামী করে। গীতায় (৫।২৩) আছে—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কাম-ক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

অনুবাদ—ইহজীবনে যিনি মৃত্যু পর্যন্ত কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ করিতে পারেন তিনিই সাধু, তিনিই সুখী। কাম ব্যাহত হইলে ক্রোধে পরিণত হয়। শরীরে রোমাঞ্চ, হৃষ্টনেত্র ও পুলকিত বদনাদি কামবেগের চিহ্ন। শরীরের কম্প, প্রস্বেদ, অধরোষ্ঠের দংশন ও আরক্ত নয়নাদি ক্রোধবেগের লক্ষণ। ভর্তৃহরি তাঁহার প্রসিদ্ধ 'বৈরাগ্য শতকে' বলিয়াছেন—

বলীভির্মুখমাক্রান্তং পলিতেনাঙ্কিতং শিরঃ।
গাত্রানি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে॥ ৮

ভর্তৃহরি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

তৃষ্ণাঃ ন জীর্ণাঃ বয়মেব জীর্ণাঃ।

অনুবাদ—মুখের চর্ম্ম সঙ্কুচিত, মাথার চুল সাদা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয় এবং একা তৃষ্ণাই তরুণী হইতেছে।...তৃষ্ণার ক্ষয় না হইয়া আমরাই জীর্ণ হইলাম। তৃষ্ণার তাড়নায় আমরাই শক্তিহীন হইতেছি। সুতরাং সর্ব তৃষ্ণার উচ্ছেদ কল্পে সংযম সাধনই সর্বতোভাবে করণীয়।

জেরোম কামশক্তি ও কামজয়ের দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে কুমারী ইউষ্টোচিয়ামকে লিখিয়াছেন, "হায়! সেই সূর্য্যদগ্ধ সুবিশাল মরুভূমির নির্জনতায় প্রবাস সাধুর পক্ষে কি ভয়ঙ্কর! তথায় কত বার না আমি নিজেকে রোমের আনন্দ-বেষ্টিত মনে করিতাম। যখনই সেই কোমল ভাব আসিত তখনই মন নামিয়া যাইত। আমার সর্বাঙ্গ একটা মোটা ছিন্ন চট্ দ্বারা আবৃত থাকিত। রৌদ্রে আমার গায়ের রঙ ইথিওপিয়াবাসীর মত ঘন কাল হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যহ আমি আর্তনাদ ও ক্রন্দন করিতাম এবং যদি আমি অনিচ্ছায় নিদ্রাভিভূত হইতাম আমার শীর্ণ দেহ শুধু মাটিতেই লুটাইত। আমার আহার্য্য ও পানীয় সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাহি না। কারণ মরুভূমিতে অসুস্থ অক্ষম ব্যক্তিরাও ঠাণ্ডা জল ব্যতীত অন্য কোন পানীয় পায় না। নরকের ভয়েই আমি নির্জন কারাবাস এবং বন্য পশু ও বৃশ্চিকের সঙ্গ স্বীকার করিয়াছিলাম। এমন অবস্থাতেও আমি প্রায়ই কল্পনায় রমণী-মণ্ডলে বেষ্টিত থাকিতাম। উপবাসে আমার মুখ মলিন থাকিত এবং জীর্ণ দেহের মধ্যে আমার মন বাসনায় জর্জরিত ছিল। আমার মৃতপ্রায় শরীরের মধ্যে কামানল প্রায়ই জ্বলিয়া উঠিত।" জেরোমের সরল উক্তি হইতে বোঝা যায়, কামজয় কত কঠিন কার্য্য।

—তের—

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপায়

স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া ছিলেন মহীশূর রাজ্যের ভূতপূর্ব দেওয়ান। তিনি একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক ও চিরকুমার পুরুষ ছিলেন। একদা কোন শিক্ষিত কুমার তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "মহাশয় আমি স্বেচ্ছায় কৌমার্য্য বরণ করিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি আমার মনে চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিরূপে আমার কৌমার্য্য রক্ষা করা যায়?" প্রবীন সংযমী পুরুষের অবিলম্বিত উত্তর আসিল, "আরো কয়েক বৎসর তোমার ভালবাসা বরফ-ঢাকা রাখ।" কোন সময় আমি এক মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ব্রহ্মচর্য্য কি?" আমি আশা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার উত্তরে কতিপয় নৈতিক বিধি ও দিনচর্য্যার উল্লেখ থাকিবে। কিন্তু আমাকে চমৎকৃত করিয়া তিনি সহজ ভাবে বলিলেন, "তোমার মনকে শিশু-মনের মত আজীবন সরল, নির্দোষ, পবিত্র ও অনাসক্ত রাখ। তাহাই কৌমার্য্য, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।" উক্ত মহাপুরুষ পুনরায় মৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, "কিরূপে কামজয় করা যায়।" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মচর্যের মূলার্থ কামজয়। কিন্তু কামজয় অসম্ভব। কারণ কাম সনাতন মহাশক্তি। বিজ্ঞান কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তিকে নষ্ট করা যায় না। কাম ভুলিতে হইবে। কামের মোড় ফিরিয়ে দাও, কামকে অতিক্রম কর এবং কামকে রূপান্তরিত কর। পরস্পরের প্রীতিকে ভালবাস, প্রকৃতিকে ভালবাস, বিদ্যার্জ্জনকে ভালবাস। তাহাহইলে কাম জয় হইবে।" কাম-চিন্তা বা কাম-ক্রিয়া বিরত হইতে হইলে এই সকল উপায়

অবশ্যই অবলম্বনীয়। কামজয় ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের একটী উৎকৃষ্ট উপায় বিদ্যাচর্চায় মাতিয়া যাওয়া। ইসলাম ধর্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ সত্যই বলিয়াছেন, "জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর কর্ত্তব্য। দোলা হইতে কবর পর্য্যন্ত সারা জীবনে জ্ঞানান্বেষণ কর। অতিরিক্ত উপাসনা অপেক্ষা অতিরিক্ত বিদ্যাচর্চা ভাল। বিদ্বানের কালী সহিদের রক্ত অপেক্ষা পবিত্রতর।"

ঋষি অরবিন্দ তৎপ্রণীত "যোগের ভিত্তি" নামক ইংরাজী পুস্তকে মন্তব্য করিয়াছেন, "ব্রহ্মচর্যের বিরুদ্ধ মতের মূলে এই ধারণা বিদ্যমান যে, মানবীয় দেহ-প্রাণ সংঘাতের ইহা স্বাভাবিক অংশ এবং আহার ও নিদ্রার মত ইহা প্রয়োজনীয় এবং ইহার সম্পূর্ণ সংযম মানসিক বিশৃঙ্খলা ও দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন করিতে পারে। অবশ্য ইহা সত্য যে, বাহ্য কর্মে কামদমন এবং মনে মনে বা অন্য ভাবে কামের প্রশ্রয় দিলে দেহের রোগ ও মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিতে পারে। ডাক্তারদের অভিমতের ইহাই কারণ এবং এই জন্যই তাঁহারা সম্পূর্ণ বীর্য্যধারণের বিরোধী। কিন্তু আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই সকল ঘটনা তখনই ঘটে যখন কল্পনায় বিভ্রান্ত প্রাণশক্তির গুপ্ত প্রশ্রয় চলে বা দুই ভিন্ন প্রাণের মধ্যে অদৃশ্য ভাব-বিনিময় হয়। যখন আত্ম-জয়ের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়দমনের প্রচেষ্টা চলে তখন কোন অনিষ্ট হয় বলিয়া আমি মনে করি না। ইউরোপে অনেক চিকিৎসক এখন স্বীকার করেন যে, কামজয়ে আন্তরিক চেষ্টা সর্বাদাই উপকারী। রেতঃতে যে মৌলিক পদার্থ আছে তাহা মানুষের দেহ মন, মস্তিষ্ক ও প্রাণাদিকে বলিষ্ঠ করে। ইহার দ্বারা জানা যায়, রেতঃকে ওজসে পরিণত করা এবং স্থূল শক্তিকে সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার কথা ব্রহ্মচর্য্যের ভারতীয় আদর্শে যাহা আছে তাহা কত সত্য, কত স্বাস্থ্যকর, কত শক্তিপ্রদ!"

ঋষি অরবিন্দ তাঁহার আর একখানি পুস্তকে, মন্তব্য করিয়াছেন, "যৌন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ইহাকে পাপমূলক, ভয়ঙ্কর ও তৎসঙ্গে আকর্ষণীয় মনে করিও না; বরং ইহাকে নিম্নতর প্রকৃতির ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট গতি বলা যায়।

ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর ; কিন্তু উহার সহিত সংগ্রাম করিয়া নহে ; উহা হইতে মন তুলিয়া লইয়া ও নিজেকে অনাসক্ত রাখিয়া এবং উহার আহ্বানে সাড়া না দিয়া। উহার প্রতি এরূপভাবে তাকাও যেন উহা তোমার নিজস্ব নহে ; পরন্তু উহা তোমার উপর বাহিরের প্রকৃতির প্রভাবে আরোপিত বস্তু মাত্র। উক্ত আরোপ ব্যাপারে সকল সমর্থন অস্বীকার কর। যদি তোমার প্রাণশক্তির কোন অংশ সমর্থন জ্ঞাপন করে, উক্ত সমর্থন প্রত্যাখ্যান করিতে জোর দাও। তোমার প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতিতে সাহায্য করিতে ভাগবত শক্তির উদ্বোধন কর। যদি তুমি শুদ্ধ ও দৃঢ় চিত্তে এবং ধীরভাবে ইহা করিতে পার তাহা হইলে পরিণামে তোমার অন্তরের সংকল্প বহিঃপ্রকৃতির স্বভাবের উপর নিশ্চয়ই আধিপত্য বিস্তার করিবে।"

"অন্নময় ও প্রাণময় কোষকে যৌন প্রকৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষার্থ সাধক সর্বদা চেষ্টিত থাকিবেন। কারণ যদি তিনি যৌন প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধনে অসমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহার দেহে দিব্য জ্ঞান ও দিব্য আনন্দের অবতরণ অসম্ভব। ইহা সত্য যে, যৌন প্রবৃত্তিকে শুধু নিষ্ক্রিয় বা আবদ্ধ রাখাই যথেষ্ট নহে। কারণ ইহা প্রকৃত পক্ষে কার্য্যকরী হয় না। যৌন সংযমের উদ্দেশ্যও তাহা নয়। যৌন প্রবৃত্তিকে শুধু দমিত করাই নিরাপদ নহে, ইহাকে মন হইতে সমূলে উৎপাটিত করাই শ্রেয়স্কর। বাসনার পরিবর্ত্তে একমুখী সাধনা থাকিবে দিব্য চেতনা লাভের জন্য। প্রীতির সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য যে, ইহাকে সর্বতোভাবে ভাগবতমুখী করিতে হইবে। প্রীতি নামে মানুষ যাহা সূচিত করে তাহা দেহ-সুখের বিনিময়ে প্রাণশক্তির আত্মবলি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যৌন ভাবের সম্যক্ বিনাশ সাধক জীবনের একটী দুরূহ ব্যাপার। ইহার জন্য প্রত্যেক সাধককে দীর্ঘকাল সাধানার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সুপ্ত মনের সাময়িক আন্দোলনের দ্বারাও কখনো কখনো যৌন ভাবের সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটে, বা কামবৃত্তির আক্রমণ হইতে চরম অব্যাহতি লাভ হয়।"

থিওজফিক্যাল সোসাইটীর অন্যতম আন্তর্জাতিক অধিনায়ক জে. কৃষ্ণমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা লিলি হিবার তৎপ্রণীত "কৃষ্ণমূর্তি ও বিশ্ব-সংকট" নামক ইংরাজি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণমূর্তি বলেন, "সেদিন আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম, কেন আমি বিবাহ করি নাই। আমি ইহার কারণ দিতেছি। আমি বিবাহের বিরোধী নহি। সমাজ যাহাকে বিবাহ বলে তাহা ঘটিয়া থাকে, কারণ নরনারীরা একক থাকে। যদি তুমি একক ভাব অতিক্রম করিতে পার তাহা হইলে বিবাহ তোমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তুমিই তোমার সর্ব্বেসর্বা। বস্তুতঃ তুমি ত একক নও। একক থাকিলে কাহারো সাহচর্য্য বা সহায়তা লওয়া বা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত নিজেকে সতত মানিয়ে চলার শিক্ষায় তোমার আবশ্যক নাই। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য নর-নারীর মিলিত ভাবে চেষ্টা করা জীবনে বড় হতে, অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পরস্পরকে বুঝতে এবং নানা সদ্‌গুণ সমৃদ্ধ করতে। পুরুষত্ব ও নারীত্ব উভয়ের বিকাশ হয় সংযত জীবনেই। সেই নৈতিক জীবনের সহিত যদি তুমি প্রীতিবদ্ধ থাক তাহা হইলে তুমি সর্বদা সমষ্টির সহিত মানিয়ে চলছ। সুতরাং তুমি তোমার সঙ্গিনীর দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সতত ঐক্যস্থাপনের প্রয়োজনের অতীত। অতএব পরিণয়ের প্রয়োজন তোমার নাই। কিন্তু কখনো নিজেদের প্রতারিত করিও না।"

পুনরায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে প্রশ্ন করা হইল, "যে বিবাহিত ব্যক্তি সাধারণ যৌন জীবন যাপন করে সে চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারে কি? আপনার জীবন-যাত্রাকে আমরা সাধু জীবন বলিয়া মনে করি। তাহা কি পরম পুরুষার্থ লাভের পক্ষে প্রয়োজন?" জগদ্বিখ্যাত নীতি-শিক্ষক কৃষ্ণমূর্তি সহাস্যে উত্তর দিলেন, "সত্য দর্শনেই শক্তির চরম পরিণতি হয়। সেই চরম পরাকাষ্ঠায় পৌছিতে হইলে গভীর ধ্যানে শক্তিকে একাগ্র করিতে হইবে। ইহাই কর্মের স্বাভাবিক ফল, মূল্যের যথার্থ নির্ধারণ। তোমারা যাহাকে সাধু জীবন বল, তাহা আমি যাপন করি শক্তির একাগ্রতা সাধনের জন্য।

ইহাতে আত্মবোধের মুক্তিলাভ ঘটে। আমি বলিতেছি না যে, তোমরা আমাকে অনুকরণ কর। তোমরা বিবাহিত বলিয়া আমি মনে করি না যে, তোমরা সেই গভীর ধ্যান লাভে অসমর্থ। কিন্তু যাহারা সমগ্ররূপে, স্বীয়ভাবে পূর্ণতার অনুভূতি কামনা করে তাহাদিগকে সমস্ত শক্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি রিপুর দাস, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও ভোগপরায়ণ, তাহার পক্ষে এই চরম অনুভূতি অসম্ভব।"

শ্রীকৃষ্ণমূর্তি বলিতে লাগিলেন, "সত্য কথা এই যে শুদ্ধ ভাব ইহার বিষয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ যদি আমি কাহাকেও যথার্থই ভালবাসি, গভীর ভাবে ভালবাসি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অনাসক্ত হইব। কারণ প্রকৃত প্রেম স্বয়ং সম্পূর্ণ। যাহা আজকাল প্রেমের নামে চলিতেছে তাহা সারশূন্য ভাবুকতা মাত্র। ইহা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থ অন্য ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। যে প্রীতি ব্যষ্টিবদ্ধ তাহা সংকীর্ণ, তাহা সসীম। যদি তোমার সুখের জন্য তুমি অন্যের সহিত জড়িত থাক, তুমি তাহাকে হারাইবার ভয়ে সর্বদাই ভীত থাকিবে। পাছে মৃত্যুর দ্বারা সে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় বা তাহার প্রীতি অন্যের প্রতি অর্পিত হয় ইহা তোমাকে নিরন্তর আশঙ্কিত রাখিবে। ব্যষ্টিপ্রেম উহার বশ্যতা, ভীতি, দ্বেষ ও দাবীর দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রণয়ী ও প্রণয়-ভাজনের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে। এখানে আমরা ব্যক্তিগত প্রেমের বিয়োগাত্মক পরিণতির চিরন্তন প্রশ্নের সম্মুখীন হই। উক্ত ব্যবধান দ্বারাই সর্বপ্রকার প্রীতির বেদনা সৃষ্ট হয়। যথার্থ প্রেম স্বয়ং-সম্পূর্ণ, দুঃখমুক্ত ও প্রতিক্রিয়ারহিত।"

আর একজন প্রশ্ন করিলেন, "যৌন প্রেমের দৈহিক বিকাশ কি জীবনকে ও প্রেমকে সীমাবদ্ধ করিয়া তোলে? যদি তাহাই হয় কিরূপে ইহা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়?" ইহাতে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ত্বরিত মন্তব্য করিলেন, "যদি তুমি এই সুখের অধীন হও, যদি তুমি এই সুখ, এই তৃপ্তিতে আসক্ত থাক তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা প্রেমের এবং জীবনের বিস্তার বদ্ধ করে। যে

ব্যক্তি মোহমুক্ত ও কামনাবর্জিত হইতে চায় তাহার সম্যক্ দৈহিক সংযম থাকা প্রয়োজন। সেই সংযম বিচার সহায়ে লাভ করিতে হইবে, নিরোধ সহায়ে বা জোর করিয়া নহে। ব্যক্তির জীবন ও উহার সার্থকতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা যতই গভীরভাবে অবহিত থাকিব ততই সেই সংযম সহজ ও স্বাভাবিক হইবে। অধিকাংশ লোকে কুফলের ভয়ে বাসনা নিরোধ করে। কিন্তু ইহা আত্মজয় নহে, ইহা আত্মনাশ। যথার্থ সংযমে আসে নমনীয়তা ও কর্মঠতা এবং দেহ পূর্ণভাবে সক্রিয় ও সংযত থাকে। স্বেচ্ছায় বিচারপূর্বক নৈতিক নিয়ম পালনকেই আমি সংযম নাম দিয়া থাকি। যে সংযম সাধনা তোমাকে তিক্ত, কর্কশ, নিষ্ঠুর ও উচ্ছৃঙ্খল করে তাহা অনাবশ্যক, তাহা অনিষ্টকর। স্বেচ্ছায় যে নিয়ম বরণ করা হয় তাহা আন্তরিকতা ও ইচ্ছুকতায় পরিপূর্ণ। উহাতে কর্কশতা থাকে না, কোমলতাই থাকে। যদি তুমি বাসনার স্বরূপ বুঝিতে পার, এবং কিরূপে ইহা উৎপন্ন হয় ও সর্বনাশ করে তাহা জান তখন উহা দুর্মূল্য রত্নে পরিণত হয়। যেরূপ বাসনাই আসল নিয়মের উৎস, বাঁধা-ধরা নিয়মাবলী অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়। শুদ্ধ স্বচ্ছ অবস্থায় যতদিন না পৌছান যায় ততদিন বিধি-নিষেধের গণ্ডী প্রগতির পথে পরিবর্তিত হইতে থাকে। সমগ্র যৌন সমস্যার মূলটি 'আমি' বোধের মধ্যে নিহিত। যতক্ষণ 'আমি' বোধ থাকে ততক্ষণ জীবন-নদীর স্রোতে জোয়ার-ভাঁটা চলে, আকর্ষণ-বিকর্ষণের বেগ কমে না। অপূর্ণতার অভিমানে মানুষ যতদিন আবদ্ধ থাকে ততদিন নরনারীগণ রিপুজয়ী হইতে পারে না।"

স্বামী অশোকানন্দ তাঁহার 'অধ্যাত্ম সাধন' নামক ইংরাজী পুস্তকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের কতিপয় হিতকর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, বিবাহিত ও অবিবাহিত নরনারীগণের প্রতি ব্রহ্মচর্য্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ইহা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং নিঃসন্দেহে ইহার অনেক গূঢ়ার্থ আছে। কিন্তু ইহার সরল ও নির্গলিতার্থ সর্বপ্রকার যৌন চিন্তা ও ক্রিয়া হইতে উপরতি।

যৌন ভাবের স্থূলতম প্রকাশ যৌন ক্রিয়া। সুতরাং যৌন ক্রিয়া সর্বাগ্রে সর্বতোভাবে বর্জনীয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য পালনে ব্যাপৃত থাকিলে ক্রমশঃ অনুভব হয় যে, এই স্থূল রূপ সূক্ষ্ম যৌন ভাবের প্রকাশ মাত্র। এই যৌন বৃত্তির সংযম ও উচ্ছেদই মুখ্য কার্য। ইহা ব্যতীত বাহ্য উপরতি অর্থহীন। যৌন বোধ আমাদের মনে দৃঢ়মূল। ব্যষ্টি জীবনের আরম্ভ হইতেই ইহা মানব মনে অধিকার বিস্তার করিয়াছে। বহু পূর্বে মনীষিগণ মন্তব্য করিয়াছেন যে যৌন ক্রিয়া ও যৌন চিন্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ। যৌন ভাবাবেশ আমাদের মানস সত্তাকে আলোড়িত করে, ইন্দ্রিয়গ্রামকে আন্দোলিত করে এবং বিচার-বুদ্ধিকে বিমোহিত করে। ভাবাবেগের অনুভব যতই কম হয় ততই আন্তর চেতনা বিশুদ্ধ থাকে। ফরাসী মনীষী মঁসিয় রুইসেন বলেন, অমোদের মনঃসমুদ্রের উপরিভাগে যে তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহার মূলান্বেষণ করিলেই কি যৌন ভাবাবেগ সম্বন্ধে সবই বলা হইল? বিপরীত পক্ষে আমাদের কি এই সুগভীর অনুভূতি হয় না যে, আমাদের অন্তর্দেশের গভীরাংশ আলোড়িত এবং আমাদের অন্তরতম প্রদেশ আকুলিত হইতেছে এমন এক শক্তি দ্বারা যাহা আমাদের সর্বাপেক্ষা সমীপবর্তী, অথচ বহু যোজন দূরে প্রসারিত।

এই অর্থে দেহবোধই যৌন ভাবের প্রধান আশ্রয়। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ঈশ্বর দর্শন না হইলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে কামমুক্ত হইতে পারে না।" একদিন তিনি তাঁহার কোন তরুণ শিষ্য দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলেন, "মহাশয় কিরূপে কামজয় করা যায়? আমি সাধ্যমত মনঃসংযম করিতে চেষ্টা করিয়াও অসৎ চিন্তা দূর করিতে পারিতেছি না। শত সতর্কতা সত্ত্বেও মনে কামচিন্তা উপস্থিত হয় এবং আমার শান্তি ভঙ্গ করে।" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরদর্শনের পূর্বে সম্যক্ কামজয় অসম্ভব। এমন কি ঈশ্বর দর্শনের পরেও কোন না কোন আকারে ইহা থাকে। যতদিন দেহ থাকে ততদিন ইহা সামান্য পরিমাণে দেখা যায়। তখন ইহা মাথা তুলিতে

পারে না। তোমরা কি মনে কর, আমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম হয়েছি? একবার আমার মনে হয়েছিল যে, কামজয় করেছি! আমি তখন পঞ্চবটী তলায় বসেছিলাম। ঠিক সেই সময় আমার মনে প্রবল কামবেগ এল এবং আমাকে অভিভূত করবার চেষ্টা করল। তখন আমি আছড়াইয়া পড়িয়া মাটিতে মুখ ঘসিতে লাগিলাম এবং জগদম্বাকে প্রার্থনা করিলাম, 'মা আমি অন্যায় করেছি, এবার আমাকে রক্ষা কর।' ভবিষ্যতে আর আমি কখনও বলব না যে, আমি কামজয় করেছি।' তখন জগন্মাতার কৃপায় কামের তোড় কমে গেল! ব্যাপার এই যে, তোমাদের জীবন নদীতে এখন যৌবনের জোয়ার এসেছে। তোমরা শত চেষ্টায়ও উহার বেগ আটকাতে পারছ না। যখন বন্যা হয় তখন ধানের ক্ষেত সব ডুবে যায়। কিন্তু কলিযুগে মনের পাপ, পাপ নয়। যদি কখনও একটা অসৎ চিন্তা মনে আসে তার জন্য নিরাশ হয়ো না। দেহ-নিঃসৃত মলমূত্রের ন্যায় শুক্রক্ষয় স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। দেহ ধারণ করলে এই সব এড়ান কষ্টকর। মল বা মূত্র ত্যাগের পরে কেউ মাথায় হাত দিয়ে ভাবে না, কি বিপদ হল। যদি কদাচিৎ কামভাব মনে আসে তার জন্য চিন্তিত হয়ো না। ক্রমশঃ এটা কমে যাবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী যোগানন্দ যখন ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক বালক ছিলেন তখন তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, কিরূপে কামজয় সম্ভব?" তদুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "সকালে ও সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে হরিনাম করবে। তাহলে কামচিন্তা দূরে পালাবে।" স্বামী যোগানন্দ প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল উপদেশে বিশ্বাসী হইতে পারেন নাই। পরে তাঁহার উপদেশ পালন করিয়া অশেষ উপকার পাইলেন। মহাত্মা গান্ধীও স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের নাম জপ দ্বারা মন হইতে সমস্ত পাপ-চিন্তা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।"

শিশুকে স্নেহ করিলে কামভাব বা কামবেগ কমিয়া যায়। শিশুকে যে

ভালবাসে না সে মানুষ নয়, সে মানুষদেহধারী নরাধম পশু। স্থূল কামশক্তি সূক্ষ্ম শিশুস্নেহে পরিণত হয়। মাতৃচিন্তা বা মাতৃসান্নিধ্য কামদমনের অনুকূল। সচ্চরিত্র পুরুষের সাহচর্য্য, ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, দেবস্থানে গমন ও গঙ্গাস্নানাদি ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য সুদৃঢ় করণে বিশেষ উপকারী।

নর-নারীর মধ্যে লিঙ্গ-ভেদ অনুভব করাও এক প্রকার যৌন ভাব। যাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে কাম রিপুর মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন তাঁহারা লিঙ্গভেদ দর্শন করেন না। তাঁহার কাছে দেহ ও লিঙ্গের সর্বভেদাতীত পরমাত্মাই প্রত্যক্ষ হয়। এই সকল বিভিন্ন অর্থে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব বুঝিতে হইবে। অবশ্য কেহ প্রথমে এত উচ্চে উঠিতে পারে না। প্রত্যেককে নিম্ন ভূমি হইতেই সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গন্তব্য স্থল বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য পালনে সাফল্য লাভ সুদূর-পরাহত। সাধককে বন্ধুর চড়াই পথের প্রত্যেক ইঞ্চি কঠিন সংগ্রাম করিয়া উঠিতে হইবে, কিন্তু তৎপরিবর্তে তিনি অপর্য্যাপ্ত উপকার পাইবেন। ব্রহ্মচর্য্য পালনে কৃতকার্য্য হইবার মূল সর্ত ধর্মজীবনের প্রতি সর্বান্তরিক আগ্রহ। শরীরকে যতই ভুলিয়া থাকা যায় ততই কাম নিস্তেজ থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্য পালনের আগ্রহাতিশয্যে দেহ-বিকার, আহার-নির্বাচন ও জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটী ব্যাপারের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হয়। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অত্যধিক নজর দেওয়াও অনিষ্টকর। এই অতিরিক্ত সতর্কতা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে অমঙ্গলজনক এবং পরিশেষে ইহা নৈতিক প্রগতি ব্যাহত করে। প্রশ্রয়দান বা মূলোচ্ছেদের উদ্দেশ্যে যে রূপেই হউক আমরা যৌন ভাবে যতই অবগাহন করিব ততই আমরা উহাকে পরিহার করিতে অসমর্থ হইব। কাম-চিন্তা ভুলিয়া থাকাই কামজয়ের উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ উপায়।

যথাসময়ে শয্যাগ্রহণ ও ভোরে শয্যাত্যাগ, প্রত্যহ ব্যায়াম বা ক্রীড়া,

নিরন্তর প্রফুল্লতা এবং উক্তরূপ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ব্রহ্মচর্য্য পালনের পক্ষে অতিশয় উপকারী। মূল লক্ষ্য ভুলিয়া আমরা এই গুলিতে যেন অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত মনোযোগ না দিই। শাস্ত্রে আছে, "ব্রাহ্ম মুহূর্তে বুধ্যেত ধর্মার্থী চানুচিন্তয়েৎ।" অর্থাৎ রাত্রির শেষ ভাগে সাধক নিদ্রাত্যাগপূর্বক ধর্মসাধনে নিযুক্ত হইবে এবং ধর্মবিরোধী কোন চিন্তা বা কাজ করিবে না। যাহারা খুব ভোরে উঠিতে চায় তাহাদের নৈশ আহার অতিশয় লঘু হওয়া দরকার। দৈহিক ব্যায়াম পুরা ভাবে শীতকালে এবং আংশিক ভাবে বর্ষাকালে করা যায়; কিন্তু গ্রীষ্মকালে বন্ধ রাখা উচিত। প্রাতে ব্যায়াম এবং সন্ধ্যায় ভ্রমণ বা ক্রীড়া অতিশয় উপকারী। ব্যায়াম না করার ন্যায় ব্যায়াম অধিক করাও অনিষ্টকর। অতিরিক্ত ব্যায়ামে নিশ্বাস দ্রুত ও ঘন হয়। ইহার ফলে অক্সিজেন ফুসফুসে যথেষ্ট সময় থাকিতে না পাইয়া রক্তের সহিত সম্যক্ মিশ্রিত হয় না। এইরূপে যে অক্সিজেন-অভাব ঘটে তাহা স্বাস্থ্যহানিকর। যাহারা অতিরিক্ত ব্যায়ামে অভ্যস্ত তাহারা দীর্ঘজীবী হয় না। এইজন্য অনেকের হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ও রক্তচাপ বাড়ে। সেইজন্য ফুটবল, হকি, ও ভলিবল প্রভৃতি শ্রমসাধ্য ব্যায়াম বর্জনই কর্তব্য। জনপ্রিয় স্বদেশী ব্যায়াম এবং ক্রীড়াদি বৈজ্ঞানিক ও আরামপ্রদ। নিয়মিত ব্যায়ামে রক্ত শুদ্ধ ও দেহ সুস্থ থাকে। পরিমিত ব্যায়ামে যে দ্রুত শ্বাস চলে তাহাতে অক্সিজেন সহজে রক্তে মিশ্রিত হয়। ইহাতে রক্ত দুষ্টি কমে ও রক্ত প্রবাহ বাড়ে। সর্বাঙ্গে রক্ত প্রবাহ ভালভাবে না চলিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুপুষ্ট হয় না। সামর্থ্যের অর্ধেক পরিমাণে ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়াম কালে কপাল, বাহুদ্বয় ও ওষ্ঠযুগল ঘর্মাক্ত হইলে বুঝিতে হইবে, অর্ধেক শক্তি অনুযায়ী ব্যায়াম হইয়াছে। তখন ব্যায়াম বন্ধ করিবে। অনন্তর প্রয়োজনীয় বিশ্রামান্তে অবগাহন স্নান বিধেয়। অধ্যাপক ব্ল্যাকী সত্যই বলেন যে, প্রাতঃস্নান অতিশয় স্নিগ্ধকর ও স্বাস্থ্যকর।

যে সকল ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয় যৌন ভাব উদ্দীপিত করে তৎসমুদয় সততই পরিহার করিবে। যাহারা যৌন চিন্তা ও ক্রিয়ায় অনুরক্ত তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। যেমন সূর্য্য সদা উত্তাপ বিকীর্ণ করে, কুসুম সদা সৌরভ বিতরণ করে এবং শবদেহ সদা দুর্গন্ধ ছড়ায় তেমনি অশুদ্ধ ব্যক্তি সদা সংক্রামক অপবিত্র ভাব বিলাইতে থাকে। ভক্তিগ্রন্থ ভাগবতে আছে, শুধু অসৎ ব্যক্তির সঙ্গত্যাগই যথেষ্ট নহে, অসৎসঙ্গ যাহারা প্রশ্রয় দেয় তাহাদিগকেও দূরে রাখিতে হইবে। অতএব অসৎ ব্যক্তির সহিত পানাহার উপবেশন ও শয়নাদি পরিহর্তব্য। এই পৃথিবী ত প্রলোভন ও কুৎসিৎ বিষয়ে পরিপূর্ণ। সুতরাং ব্রহ্মচারী অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে জীবন যাপন করিবে। রাজা জনকের উপদেশে ব্যাসপুত্র শুকদেব যেরূপ মস্তকে জল-পূর্ণ পাত্র লইয়া মিথিলার রাজপথে চলিয়াছিলেন তদ্রূপ সতর্ক ভাবে ব্রহ্মচারী সমাজে বিচরণ করিবে। মিথিলার রাজপথে স্থানে স্থানে তরুণীদের নৃত্যগীতাদি এবং অন্যান্য প্রলোভনীয় বস্তু দেখিয়াও শুকদেবের মন কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি স্বশিরোপরি জলপাত্র হইতে একবিন্দু জলও না ফেলিয়া জনকের রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। যদি আমরা প্রলোভনীয় বস্তুসমূহের প্রতি কঠোর ঔদাসীন্য অভ্যাস না করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তৎসমুদয় দ্বারা বিচলিত হইব।

প্রাতে সূর্য্যোদয়ের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে শয্যাত্যাগ করিবে। উক্ত কালকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত বলে। 'আহ্নিক তত্ত্বম্'' অনুসারে "সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ অর্দ্ধপ্রহরে দ্বৌ মুহূর্তৌ, তত্রাদ্য ব্রাহ্মঃ।'' অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে ৯৬ মিনিটের মধ্যে প্রথম ৪৮ মিনিটকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত বলে। এই সময়ে শয্যাত্যাগ, মলমূত্র ত্যাগ ও অবগাহন স্নান অতিশয় উপকারী। জাবালি বলেন, "নিত্যং স্নায়াৎ অনাতুরঃ।" অর্থাৎ আতুর ও অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই নিত্য স্নান করিবে। আয়ুর্বেদাচার্য্য চরক বলেন :—

দৌর্গন্ধ্যং গৌরবং তন্দ্রাং কণ্ডূমলমরোচকম্।
স্বেদং বীভৎসতাং হন্তি শরীরপরিমার্জনম্॥
পবিত্রং বৃষ্যমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহম্।
শরীরবলসন্ধানং স্নানমোজস্করং পরম্॥

অনুবাদ—শীতল বা গরম জলে সকালে বা সন্ধ্যায় অবগাহন স্নান ও দেহমার্জন করিলে দেহের দুর্গন্ধ ও ভার, নিদ্রালুতা, গাত্রকণ্ডুয়ন, মুখের অরুচি, ঘাম, ক্লান্তি ও ময়লা দুরীভূত হয়। ইহা দীর্ঘ জীবন দায়ক, ও বলবর্দ্ধক এবং স্বাস্থ্যকর।

শাস্ত্র এবং মনীষিগণ আমাদের 'প্রাতঃকৃত্য প্রকরণ' সম্বন্ধে বহু নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারা মধ্যাহ্ন স্নানের পুর্বে গাত্রে তৈলমর্দন করিতে বলিলেও প্রাতঃ স্নানে তৈল মদ্য তুল্য বিধায় উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মুখ ব্যতীত শরীরের অষ্টদ্বারে ও পদতলে, নখে এবং দন্তেও তৈল মর্দন স্বাস্থ্যকর। গৃহস্থ্য প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নে এবং ব্রহ্মচারী ত্রিসন্ধ্যায় স্নান বার মাসই করিবেন। প্রাতঃস্নানে সর্বরোগ বীজ নষ্ট, নিরালস্য, দীর্ঘায়ু ও লক্ষ্মী লাভ হয়।

—চৌদ্দ—

আহার ও ব্রহ্মচর্য্য

চা, কফি, গাঁজা, ভাঙ, আফিং ও মদ প্রভৃতি খাওয়া একেবারে ছাড়িতে হইবে। কারণ ইহাতে পাকস্থলীর হজমশক্তি কমিয়া যায় এবং রক্তে যে টক্সিন এসিড জন্মে তাহা হৃৎপিণ্ডকে দুর্বল করে। নস্য গ্রহণ এবং বিড়ি, সিগারেট, ও তামাক খাওয়াও অপকারী। মাদক দ্রব্য খাইলে দেহ ক্ষণকাল উত্তেজিত হয় বটে ; কিন্তু প্রতিক্রিয়ার ফলে দেহ পুনরায় দুর্বল হইয়া পড়ে। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আছে, মাদক দ্রব্য কখনও গ্রহণ করিবে না এবং অন্যকেও দিবে না। কোরাণ অনুসারে মাদক দ্রব্য গ্রহণ অবৈধ অনৈতিক। হজরত মহম্মদ বলেন, "কখনও মদ্যপান করিবে না, কারণ ইহা সকল অনিষ্টের মূল।' অধ্যাপক ব্ল্যাকী মন্তব্য করেন, "অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্য ব্যবহার এবং মদ্যপান ও ধূমপান স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে পরিত্যজ্য। বিশুদ্ধ জলপান কখনও অনিষ্ট করে না। যিনি মদ্যাদি মাদক দ্রব্য গ্রহণ হইতে বিরত হন তিনি কখনও নর্দমায় পড়িয়া মরেন না এবং বিপদকালেও নিজেকে এবং বন্ধুবর্গকে সাহায্যার্থ রিক্ত-হস্ত হন না।"

বাসি, পচা ও ভেজাল খাদ্য বিষবৎ পরিহার করিবে। মনুসংহিতা বলেন, শুক্তং পর্য্যুসিতং অন্নং পরিবর্জয়েৎ। অর্থাৎ শুষ্ক ও বাসি আহার গ্রহণ করিবে না। গীতায় (১৭।১০) আছে।—

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যম্ ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥

অনুবাদ—মন্দপক্ক, নীরস, দুর্গন্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও নিষিদ্ধ আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

নস্ত, বিড়ি সিগারেট, তামাক, মদ, চা, কফি, আফিং ও গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য বিষবৎ অভক্ষ্য ও অনিষ্টকর। ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁহার গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যগণকে 'মাদকদ্রব্য বর্জনের ব্রত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। রোগাক্রান্ত বা চরিত্রহীন ব্যক্তির সহিত যত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকুক না কেন তাহার হাত হইতে আহার্য গ্রহণ অনুচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতির্লব্ধে সর্বগ্রন্থীনাম্ বিপ্রমোক্ষঃ।" অর্থাৎ "আহার শুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে। ধ্রুবা, স্মৃতি লাভ হইলে সর্বগ্রন্থি সংছিন্ন ও মুক্তিলাভ হয়।" ভুক্তাবশিষ্ট আহার্য্য বা পানীয় কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিবে না, বা অন্তকেও দিবে না। মনু সংহিতায় আছে "নোচ্ছিষ্টম্ কস্তচিদ্ দত্তাৎ!" ইহার অর্থ উচ্ছিষ্ট দ্রব্য কাহাকেও দিবে না। আহারের পুর্বে ঠাণ্ডা জলে হস্ত পদ ও মুখ ধৌত করিবে এবং বিশ্রাম লইবে। মৌন ভাবে ও প্রফুল্ল চিত্তে আহার করিতে হয়। আহারকালে কথা বলিলে চর্বণ ব্যাহত হয় এবং তজ্জন্ত হজমের ব্যাঘাত জন্মে। আহারকালে মৌনভাব বা বাক্‌সংযম অশেষ উপকারী। ঋষি অত্রি বলেন, "মহামৌনম্ অশ্নিয়াৎ"; অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্বাক থাকিয়া আহার করিবে। ব্যাসদেব বলেন, "মৌনমাস্থিতঃ অশ্নীয়াৎ।" ইহার অর্থ তূষ্ণী অবস্থায় আহার করিবে। যখন মন উত্তেজিত বা আন্দোলিত থাকে তখন আহার করিবে না। যে খাত্ত খাইতে ইচ্ছা হয় না তাহা কখনও মুখে দিবে না। মনু সংহিতা বলেন পূজয়েৎ অনশনং নিত্যম্।' অর্থাৎ নিত্য আহার্য দ্রবকে পবিত্র জ্ঞান করিবে।' সেইজন্ত হিন্দু সমাজে আহারের পুর্বে ভোজ্য দ্রব্য ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করার বিধি প্রচলিত। যে খাত্ত খাইতে ইচ্ছা হয় না তাহা খাইলে জীর্ণ হয় না। খাত্তদ্রব্য উত্তমরূপে চর্বণ ও গলাধঃকরণ করা কর্তব্য। তাড়াতাড়ি খাওয়াও অপকারক। অতিরিক্ত আহারও অনিষ্টকর। পাকস্থলীর উপর গুরুভার চাপাইলে অসুখ হয়।

কোরাণে আছে "যাহারা আতিশয্য-দোষে দুষ্ট তাহাদের প্রতি আল্লা রুষ্ট। কখনও অতিরিক্ত আহার করিও না।" হজরত মহম্মদ কোরাণবাক্য সমর্থন-পূর্বক বলেন, "আহারের আধিক্যে স্বাস্থ্যহানি হয়। বস্তুতঃ পরিমিত আহার স্বাস্থ্যরক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়।" ডাঃ রাও বলেন, "আধুনিক কালে বিজ্ঞান মানব শরীরে দেহ-মনের অদ্ভুত পারস্পরিক সাপেক্ষতা প্রমাণিত করিয়াছে। অতএব দেহপুষ্টি ও নীরোগ স্বাস্থ্যের উপর বুদ্ধিমত্ত', স্নায়বিক শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।"

নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ আহার করা উচিত। সোডা, লেমনেড প্রভৃতি পানীয় উপকারক নহে। শুদ্ধ জলই শ্রেষ্ঠ পানীয়। আহারকালে অধিক জল পান করিবে না। কারণ ইহা দ্বারা পাকস্থলীতে নিঃসৃত রস পাতলা হইয়া যায়। আহারের পূর্বে জলপান দেহকে শীর্ণ করে এবং আহারান্তে জলপান দেহকে স্থূল করে। অন্যের গামছা, রুমাল, জামা, কাপড়, বিছানা, জুতা, চাদর ও বালিশ প্রভৃতি ব্যবহার করা অনুচিত।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে বাক্‌সংযম অত্যাবশ্যক। যে বেশী কথা বলে সে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলে। মহাভারতে আছে, "বাক্‌সংযমী ও মিতভাষী হওয়া অত্যন্ত কঠিন কার্য। প্রগল্‌ভ ব্যক্তির কথায় সত্য অপেক্ষা মিথ্যাই বেশী থাকে।" ইন্দ্রিয়সংযম না থাকিলে ব্রহ্মচর্য্য পালন অসম্ভব। মহম্মদ বলেন, "যে মানুষ কায়মনোবাক্যে সত্যভাষী নয়, সে মানুষই নয়। যে ভোগতৃষ্ণা দমন করে সে-ই বুদ্ধিমান্‌ ও বিবেকী। যে ভোগতৃষ্ণা অনুসরণ করে সে মূঢ় ও পাপী।"

খাদ্যতত্ত্ববিৎ স্যার পার্দে লুকিস বলেন, "মাংসের পরিবর্তে ডাল ব্যবহার করিবে। ভাত-ডাল একত্রে খাইলে সহজপাচ্য হয়। কলাই শুটি ও ছোলা ও আলু সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে বলকারক হয়।" ডাঃ লুকিস আরো বলেন, বর্ষার জল শ্রেষ্ঠ পানীয়। তৎপরে নদী বা কূপের জল ভাল।" জল পাকস্থলীতে যাইয়া অন্যান্য ভুক্তদ্রব্যের রাসায়নিক ক্রিয়ার সহায়ক হয়।

তন্তুগঠনে শুদ্ধজল বেশী উপকারক। সমগ্র দেহের এক তৃতীয়াংশ জলেপূর্ণ। মস্তিষ্ক এবং তন্তুসমূহে শতকরা আশী ভাগ জল এবং এমন কি অস্থিরাজিতেও শতকরা বিশ ভাগ জল। সেইজন্য আর্যগণ জলকে প্রাণ বলিয়াছেন। জল বৃহদন্ত্রে যাইয়া হজম হয় এবং তাহা হইতে মুত্রাশয়ে চলিয়া যায়। শীতকালে প্রাতে চা বা কফির পরিবর্তে গরম জল খাইবে।

দৈনিক আহার্যে নিম্নোক্ত চারি প্রকার দ্রব্য থাকা উচিত।—(১) দুধ, ডাল, কলাইশুটি প্রভৃতি প্রোটিন (আমিষ) জাতীয় খাদ্য। উক্তরূপ আহার তন্তুগঠন করে, দেহক্ষয় বন্ধ করে, দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি করে, মেদ বৃদ্ধি করে এবং রক্তে অক্সিজেন মিশ্রিত করে। (২) মাখন, ঘি, তিলাদি তৈল-জাতীয় পদার্থ। এইগুলি দেহের তেজ ও মেদ বৃদ্ধি করে, এবং উত্তাপ সৃষ্টি করে। (৩) চাউল, গম, বার্লি, আলু, চিনি ফল ও শাক-সব্জী প্রভৃতি শর্করাজাতীয় পদার্থ। (৪) তরকারী, ফল ও শাক শবজী প্রভৃতি লবণ জাতীয় পদার্থ। এই সকল দ্রব্য জিহ্বার লালায় লবণ সৃষ্টি করিয়া হজমের সহায়ক হয়। ইহা পাকস্থলীতে ক্লোরিন সরবরাহ করে ও তন্তুগঠন করে। কতকগুলি খাদ্য লবণ ব্যতীত পরিপাক হয় না। কিন্তু অতিরিক্ত লবণ খাওয়াও অনিষ্টকর। কারণ যদি অতিরিক্ত লবণ মুত্রাশয় দিয়া দেহের বাহিরে চলিয়া না যায় তাহা হইলে শরীরে অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হইয়া বহুবিধ জটিল ব্যাধি সৃষ্টি করে। ইহার ফলে হাইড্রোসিল ও শোথ প্রভৃতি রোগ জন্মে। যাহাদের বাতরোগের প্রবনতা আছে তাহারা লবণ খাইলেই ভাল।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে অধিক কোমলভাব মনে স্থান না দেওয়াই উচিত। অত্যাধিক নিদ্রা বা অত্যল্প নিদ্রা দুইই অপকারক। নৈশ আহার যথা সম্ভব লঘু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নৈশ আহার অর্ধেক হজম হইলে নিদ্রা যাইতে হয়। অর্থাৎ নিদ্রা-গমনের দুই ঘন্টা পূর্বে নৈশ আহার করিবে। সম্পূর্ণ পরিপাকের জন্য ভক্ষিত স্থূল আহার্য মুখে উত্তমরূপে চর্বিত ও লালা-মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। বদহজম বায়ু, পিত্ত, কফ ও রসের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। ইহার ফলে শুক্র

তরল হয়। গীতার মতে ব্রহ্মচারী মিতাহার ও বিহার করিবে। অনাহারী কিংবা অতিভোজীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য পালন অসম্ভব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে (৬।১৭) বলিয়াছেন, "যোগী যুক্তাহার ও বিহার করিবে এবং কর্মে যুক্তচেষ্ট হইবে। যাহার নিদ্রা ও জাগরণ কালে ও পরিমাণে নির্দিষ্ট তাহার সাধনা সফল ও সুখকর হয়।" রাত্রির আদি ও অন্তভাগে জাগরণ ও মধ্যভাগে নিদ্রা যাইতে হয়। মিতাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে এই বিধি আছে—

অর্ধং সব্যঞ্জনান্নস্য তৃতীয়কমুদকস্যতু।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ॥

অনুবাদ—সাধক ব্যঞ্জন ও অন্ন দ্বারা উদরের অর্ধভাগ এবং জলের দ্বারা এক-চতুর্থাংশ পূর্ণ করিবে এবং বায়ু সঞ্চরণের জন্য অবশিষ্ট চতুর্থাংশ শূন্য রাখিবে।

বাঁচার জন্যই খাওয়া, খাওয়ার জন্যই বাঁচা নহে। এই কথা সদা স্মরণ রাখিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য পালনের পক্ষে জিহ্বা-সংযম অপরিহার্য। শাস্ত্রে আছে—

তাবৎ জিতেন্দ্রিয়ং ন স্যাৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েৎ রসনং যাবৎ জিতং সর্বং জিতে রসে॥

অনুবাদ—জিহ্বা সংযত না করা পর্য্যন্ত অন্য ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিলেও কেহ জিতেন্দ্রিয় হয় না। রসনা জয় হইলেই সকল ইন্দ্রিয় বিজিত হয়।

সন্ত তুলসীদাস বলেন—

কাম ক্রোধ মদ লোভকী জবলক্ মনমে খান।
তবতক্ পণ্ডিতমূরখো তুলসী এক সমান॥

অনুবাদ—যতদিন মনে কাম, ক্রোধ, মদ ও লোভ থাকে ততদিন পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়ই সমান। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত পাণ্ডিত্য অর্থহীন।

জীবনের অনিত্যতা ও মৃত্যুর নিশ্চয়তা সদা স্মরণ করিলে কামদমন সহজেই সম্ভব হয়। দেহই কাম-ভোগের একমাত্র আয়তন। দেহ নষ্ট হইলে কামভোগ কিরূপে সম্ভব? মনু সংহিতায় (২।৯৯) আছে—

ইন্দ্রিয়ানাং তু সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্।

অনুবাদ—সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি একটী মাত্রইন্দ্রিয় অসংযত থাকে তাহা হইলে উহা দিয়াই তাহার প্রজ্ঞা ক্ষরিত হয়, যেরূপ সছিদ্র পাত্র হইতেজল বাহিরে চলিয়া যায়।

নিয়মিত উপবাস বা অনশন ব্রহ্মচর্য্য পালনের সহায়ক। মাসে দুইটি একাদশী রাত্রি এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা রাত্রি এই চার রাত্রিতে উপবাস বিশেষ উপকারী। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আছে, "লঙ্ঘনং পরমৌষধম্। ইহার অর্থ উপবাস রোগের মহৌষধ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীশিষ্য মহাতপস্বী দুর্গাচরণ নাগ কামজয়ের জন্য দীর্ঘ উপবাস করিতেন। মহাত্মা গান্ধী স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছেন, অনশন ইন্দ্রিয়দমনার্থ অপরিহার্য্য। তিনিও বহুবার জীবনে সুদীর্ঘ উপবাস করিয়াছেন। রাত্রিতে শয়নকালে ওঙ্কার বা কোন প্রিয়দেবতার নামজপ করিয়া নিদ্রিত হইলে সুনিদ্রা আসে, দুঃস্বপ্নাদি হয় না। রাত্রিতে নিদ্রাকালে বা দিবাভাগে বিশ্রাম সময়ে বাম পাশ চাপিয়া শয়ন করিতে হয়। পার্শ্ব পরিবর্তনার্থ কখনো কখনো ডান পাশ চাপিয়া শয়ন চলে, তবে তাহা অল্পক্ষণের জন্য। চিৎ হইয়া শয়ন করা কদাপি উচিৎ নহে। কারণ ইহাতে স্নায়ু-মণ্ডলীর উপর চাপ পড়ে। অন্ততঃ গ্রীষ্মকালে সকালে ও সন্ধ্যায় দিনে দুইবার শীতল জলে স্নান স্বাস্থ্যকর। শীতকালে একবার স্নান করিলেও চলে। কিন্তু শীতকালে অসুস্থ না হইলে স্নান বন্ধ রাখিবে না। ব্রহ্মচারীর পক্ষে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মৌলিক।

"শুচিতা ও পবিত্রতা" সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে—

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥

অনুবাদ—বাহ্য ও আন্তর ভেদে শাস্ত্রে দুই প্রকার শৌচ কথিত। মাটি

দ্বারা শৌচ বাহ্য এবং ভাবশুদ্ধি বা মানসিক পবিত্রতাই আন্তর শৌচ।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের পক্ষে উক্ত দুই প্রকার শৌচই উপকারী। অধিক গরম কাপড়-জামাদি ব্যবহার অনুচিত। বিনা প্রয়োজনে দেহকে অসহ্য শীতে অনাবৃত রাখাও উচিত নহে। অত্যধিক শীত বা গ্রীষ্ম সহন বা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ব্রহ্মচারী পরিহার করিবে। শাস্ত্রে আছে, "উপানহৌ চ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈঃ ন ধারয়েৎ।" অর্থাৎ অন্যের ব্যবহৃত জুতা, খড়ম ও বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে না। শয়ন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধি এই, "একঃ শয়ীত সর্বত্র।" ইহার অর্থ সর্বত্র একাকী শয়ন করিবে। কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া শোওয়া উচিত নয়। কারণ এইরূপ শয়নে দূষিত বায়ু সেবন করিতে হয় এবং মাথা গরম হইয়া উঠে। আমাদের পরিত্যক্ত প্রশ্বাস বিষাক্ত। ইহা পুনরায় গ্রহণ করা অনুচিত। উন্মুক্ত স্থানে নিদ্রা যাওয়া স্বাস্থ্যকর। নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসকে নিয়মিত করিতে হইবে। যোগশাস্ত্রমতে দিনে বাম নাকে ও রাত্রে ডান নাকে নিশ্বাস লইবে। সকালে ও সন্ধ্যায় উভয় নাকে নিশ্বাস লওয়া স্বাস্থ্যকর। মনু সংহিতায় আছে—

একঃ শয়ীত সর্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ কচিৎ।
কামাৎ হি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥
স্বপ্নে সিক্তা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কম্ অর্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্রিচং জপেৎ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মচারী স্বীয় শয্যায় একাকী শায়িত থাকিবে এবং কখনো বীর্যক্ষয় করিবে না। যে স্বেচ্ছায় বীর্যপাত করে সে তাহার ব্রহ্মচর্য ব্রত ভঙ্গ করে। যদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বীর্যপাত হয় তাহা হইলে ব্রহ্মচারী প্রাতে উঠিয়া স্নানান্তে সূর্যদেবকে অর্চনাপূর্বক তিনবার এইঋক্ মন্ত্র জপ করিবে, যে সূর্যদেবের কৃপায় পুনরায় আমার বীর্যক্ষয় হেতু নষ্টশক্তি ইন্দ্রিয়ে ফিরিয়া আসুক।

যদি সতর্কতা সত্ত্বেও স্বপ্নদোষ হয় তাহাতে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ

নাই, অনেক সময় আহারের জন্য এইরূপ হয়। প্রতি মাসে দুই এক বার স্বপ্নদোষ বিশেষ অনিষ্টকর নহে। এই সব বিফলতা সত্ত্বেও আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ক্রমশঃ মন যতই শুদ্ধ ও শান্ত হয় ততই স্বপ্নদোষ কমিয়া যায়, এমনকি একেবারে বন্ধও হয়। আহার-সংযম ও চিত্ত-শুদ্ধি যতই বাড়িবে স্বপ্নদোষ ততইকমিবে। জগতে এরূপ শুদ্ধচিত্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি খুব বিরল, যাঁহারা ইহার কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইহার জন্য ঔষধ খাওয়া বা চিন্তিত হওয়া অনাবশ্যক। ঔষধসেবন ও দুশ্চিন্তাতে কখনো কখনো বিপরীত ফল হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বপ্নদোষ অজীর্ণতা, অধিক আহার, কোষ্ঠবদ্ধতা বা স্বপ্নময় নিদ্রার জন্য হয়। আমাদের নিদ্রা স্বপ্নশূন্য ও শান্তিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে রাত্রে স্বপ্নদোষ হয় তৎপর দিন আংশিক বা সম্পূর্ণ উপবাস, ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করা মঙ্গলকর। এইসকল অভ্যাসের মিলিত ফলে একটী অত্যদ্ভুত কল্যাণকর প্রতিক্রিয়া জন্মে। সাধারণতঃ শেষ রাত্রে তিনটার পর স্বপ্নদোষ ঘটে। সেই সময় মলভাণ্ড ও মূত্রাশয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন উঠিয়া মলমূত্র ত্যাগ হিতকর। মল মূত্র বা বায়ুর বেগ ধারণ বা রোধ করিলে শুক্রতারল্য ও কামোত্তেজনা হয়। শেষ রাত্রে দুইটার সময় মলমূত্র ত্যাগ ও মলভাণ্ড ও মূত্রাশয়কে শূন্য করা প্রতিরোধক অভ্যাস। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া মলমূত্রত্যাগ ও দন্তমার্জন, প্রাতঃস্নান ও ঈশ্বরচিন্তা নিত্য অভ্যাসে পরিণত হওয়া আবশ্যক।

দিবারাত্র কৌপিন পরিধানে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা দমিত হয়। প্রাতে নিশ্বাস ব্যায়াম, সন্ধ্যায় দ্রুত ভ্রমণ এবং প্রত্যহ সিদ্ধাসন ও গোরক্ষাসন অভ্যাস ব্রহ্মচর্য্যের সহায়ক। যোগাসন ও প্রাণায়াম নিকটস্থ অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষিতব্য। যে সকল বই পড়িলে মন উচ্চ চিন্তায় পরিপূর্ণ হয় সেই সকল বই পড়িবে। মহাপুরুষদের জীবনী অনুধ্যান করিলে গভীর প্রেরণা পাওয়া যায়। মৃত্যুর ধ্যান ও জীবনের নশ্বরতা সতত স্মরণ করিলে কাম দূরে পলায়ন করে। ভাগবতে আছে, "অদ্যবাপি শতাব্দান্তে মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাম্ ধ্রুবঃ।" অর্থাৎ আজ বা এক শত বৎসর পরে প্রাণীর মৃত্যুই সুনিশ্চিত। নিত্য ভাবিবে যে

এই দেহ চিরস্থায়ী নহে এবং ইহা যে কোন মুহূর্ত্তে নষ্ট হইতে পারে। এইরূপ বিচারে দেহাসক্তি কমিয়া যায়। দেহাসক্তি কমিলেই কামবেগ প্রশমিত হয়।

মহাত্মা গান্ধী পরামর্শ দেন যে, যখন কোন তরুণ বা তরুণী যৌন ভাবে অভিভূত হয় তৎক্ষণাৎ তাহার কর্তব্য ঠাণ্ডা জলে অবগাহন করা। ইহাতে কামজনিত উত্তেজনা ও উত্তাপ শীতল হইয়া যায় এবং মন শান্ত ভাবে পরিপূর্ণ হয়। ইংরাজ মনীষী পল ব্রাণ্টন তাঁহার "গুপ্ত পথ" নামক পুস্তকে বলেন, যদি কখনও তোমার আত্ম-সংযম উগ্র রিপু বা প্রচণ্ড কুভাব দ্বারা বিপর্যস্ত হয় তৎক্ষণাৎ গভীর নিশ্বাস ব্যায়াম অভ্যাস কর। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে আকস্মিক বিপদ অতিক্রান্ত। উক্ত প্রকার অবস্থায় প্রাণায়ামের লক্ষণীয় সুফল পাওয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান জল-চিকিৎসক লুই কুনে তাঁহার "অভিনব চিকিৎসা-বিজ্ঞান" নামক পুস্তকে মন্তব্য করেন, "দীর্ঘকাল হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত বালকগণকে কিছুকাল লিঙ্গস্নান করাইয়া উক্ত দোষ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে।" সেইজন্ম হিন্দুশাস্ত্রে প্রস্রাবান্তে অণ্ডকোষ ও জননেন্দ্রিয় জল-ধৌত করিবার বিধি আছে। অনৈতিক পুস্তকাদি আদৌ পড়িবে না। অশুদ্ধ চিন্তা দমনের মহৌষধ সৎচিন্তা। থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি যে সকল বস্তু কামাদি রিপু বর্ধন করে সেগুলি সযত্নে পরিহার করিবে। সকল প্রকার উত্তেজক ও মাদক দ্রব্য বর্জনীয়। প্রত্যহ প্রাতে পবিত্রতা লাভের জন্ম আন্তরিক উপাসনা অশেষ ফলপ্রদ। জার্মানী ও অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক চিকিৎসকগণ বলেন, "জল ও মাটির চিকিৎসা এবং অনুত্তেজক ফলাহার স্নায়ুমণ্ডলীকে শীতল রাখে এবং আমাদের পাশবিক প্রবৃত্তিকে দমিত এবং মানব দেহকে শক্তিশালী করে।" জার্মান মনীষী এডল্‌ফ জুষ্ট তাঁহার "প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন" নামক পুস্তকে ফলাহারের কতিপয় নির্দেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য পালনের পথে সর্বপ্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট বিষয় এই যে, স্বীয় জীবনে উহার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব

করা এবং জীবন ও জগতের সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করা।

নিদ্রা যাইবার পূর্বে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সংচিন্তা করা উপকারী। এই সকল সংচিন্তা নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের সুপ্ত মনকে প্রভাবিত রাখে। প্রত্যহ রাত্রে ছয় ঘণ্টা নিদ্রা স্বাস্থ্যকর। শাস্ত্রে আছে, "প্রহরদ্বৌ শয়নো হি ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে"। যে দুই প্রহর অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা সুষুপ্তি উপভোগ করে সে ব্রহ্মলাভের অধিকারী। মধ্য রাত্রির পূর্বে এক ঘণ্টা নিদ্রা মধ্য রাত্রির পরে দুই ঘণ্টা নিদ্রাব সমান।

———

—পনের—

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য

যাঁহারা স্বেচ্ছায় চিরকৌমার্য বা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য বরণ করেন, তাঁহাদের শুভ সঙ্কল্পে আমরা যতই শ্রদ্ধা করি না কেন ইহা সুস্পষ্ট যে, তাঁহারা যে পথ মনোনীত করিয়াছেন, সেই পথে গমন মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষেই সম্ভব এবং তাহা সাধারণের গন্তব্য পথ নহে। সমাজের মুষ্টিমেয় নরনারী চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অবশিষ্ট বিশাল মনুষ্য সমাজ বিবাহিত জীবনের পথই অনুসরণ করিবে। বিবাহের পূর্বে যৌবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যই জীবন-ব্রত হওয়া উচিত। কিন্তু বিবাহিত জীবনেও যতদূর সম্ভব ব্রহ্মচর্য পালন করা বিধেয়। ফরাসী মনিষী পল বুরো মন্তব্য

করেন, "যে ব্যক্তি যৌবনে পদার্পণপূর্বক যৌন ভাবের আবেগ অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অনুভব করেন তাঁহাকে মানব সমাজ এই প্রাথমিক নীতি-শিক্ষা দেয় যে, যতদিন সে অপরিণীত থাকিবে ততদিন সে যৌন ক্রিয়া হইতে বিরত হইবে।" নিশ্চয়ই ব্রহ্মচর্যের ন্যায় কোন স্বাস্থ্য-বিধি কোন দেশে, কোন কালে এত ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয় নাই। আমরা যখন সমাজে অসংখ্য নৈতিক লঙ্ঘন অনুধাবন করি তখনই বুঝিতে পারি, অগণিত অচিন্ত্যশীল ব্যক্তি বার বার এই স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। বিবাহিত নর-নারী উভয়ের পক্ষেই যৌন সংযম স্বাস্থ্যকর। যে সমাজে তরুণ-তরুণীরা জনসাধারণ ও সরকার পক্ষ হইতে যৌন প্রশ্রয়ের সমর্থন পায়, কিরূপে সে সমাজে নৈতিকতা ও মানবতা রক্ষিত হয়? নৈতিকতা কি মানবতার ভিত্তিভূমি নহে?

ইংরাজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল বিবাহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে যৌন প্রশ্রয় সম্বন্ধে যে সরল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা শত শত পাঠক-পাঠিকার জীবনে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বিবাহের পূর্বে আমাদের তরুণরা কল্পনায় কলুষিত, দেহে অবসন্ন ও নৈতিক চরিত্রে অবনত হইয়া পড়েন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহারাই আবার পরিণীতা পত্নীদের নিকট হইতে নিষ্কলুষ পবিত্রতা ও সতীত্ব দাবী করেন!

এইজন্য তরুণ-তরুণীরা দোষার্হ নহে। যে সভ্যতায় আমরা জাত ও বর্দ্ধিত উহার নৈতিক মূল্য আশাতীত ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের সভ্যতা প্রতিপদে আমাদের তরুণ-তরুণীদিগকে যৌন প্রশ্রয় ও উত্তেজনার যে সুযোগ ও সুবিধা দিতেছে অশিক্ষিত অসংযত ব্যক্তির পক্ষে সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের শিক্ষালয়ে বা গৃহে আবশ্যকীয় নৈতিক পরিবেশ নাই। ইহার ফলে আমাদের সমাজে নৈতিক আদর্শ শোচনীয়রূপে অবনত হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল তারুণ্য আমাদের সমষ্টি-জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছে।

রঙ্গমঞ্চ আর একটি ক্ষেত্র যথায় যৌন ভাবের স্রোত উদ্ভূত ও সমাজে প্রসারিত হয়। জনৈক ফরাসী মনীষী বলেন, "পাশ্চাত্যের রঙ্গমঞ্চে যৌন ভাব এত অধিক পরিমাণে প্রশ্রয় পাইতেছে যে, আমাদের মনে হয়, সুবিখ্যাত এম, ডি, চিরাকের সময় যেরূপ হইয়াছিল তদ্রূপ এখনো যে কোন সময় রঙ্গমঞ্চে যৌন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে।" শুধু পাশ্চাত্যে যে এরূপ অবস্থা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান তাহা নহে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ভারতেও অনুরূপ অবস্থা চলিতেছে। তরুণ তরুণীদের মধ্যে যৌন ভাবের প্রাবল্য, ব্যভিচার ও বিবাহ-বিচ্ছেদের বৃদ্ধি এবং গর্ভপাত ও গর্ভনিরোধ প্রথার প্রচলনাদি ব্রহ্মচর্য্য বিরোধী অসংখ্য নর-নারীর অসৎ মনোভাবের জমাট কুফল। চির-কৌমার্য্য বা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি যতই অবজ্ঞা বাড়িবে ততই বিবাহের আদর্শ নামিয়া যাইবে। সুসংযত বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য চির কালই উচ্চ স্থান লাভ করিবে।

ষোল

সক্রেটিশ ও বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য

গ্রীসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সক্রেটিশ বিবাহিত জীবন যাপন করেন। তিনি বিবাহিত জীবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অন্যতম শিষ্য একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূজ্যদেব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন, বিবাহিত গৃহস্থ কতবার তাহার পরিণীত পত্নীর সঙ্গ করিতে পারে?" জিতেন্দ্রিয় সক্রেটিশ উত্তর দিলেন, "সারা জীবনে মাত্র একবার।" শিষ্য অপ্রতিভ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রদ্ধার্হ গুরুদেব, গৃহীদের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। রিপুবর্গ ভয়ঙ্কর ও কষ্টদায়ক। এই জগৎ নানা প্রলোভন ও আকর্ষণে পরিপূর্ণ! প্রলোভন প্রতিরোধ করিবার সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি গৃহস্থদের নাই। তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম অতিশয় প্রবল। আপনি দার্শনিক ও মহাযোগী। আপনার পক্ষে চিত্তসংযম সহজ। দয়া করিয়া একটী অধিকতর সরল পথ তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করুন।" তখন সক্রেটিশ উত্তর দিলেন, "গৃহী ব্যক্তি বৎসরে একবার মাত্র স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারে।" শিষ্য আবার বলিলেন, "হে পূজ্য গুরো, বিবাহিত দম্পতীর পক্ষে ইহাও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কৃপা পূর্বক আরো সহজ উপদেশ দিন।" তখন সক্রেটিশ উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, হে প্রিয় শিষ্য তবে মাসে একবার। ইহা অত্যন্ত সহজসাধ্য। আশাকরি, তুমি এখন সন্তুষ্ট হইয়াছ।" ইহাতে শিষ্য, উত্তর দিলেন, "শ্রদ্ধেয় মহাশয়, এমন কি, ইহাও তাহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। তাহাদের চিত্তসমূহ কামগ্রস্ত। তাহারা একদিন স্ত্রীসঙ্গ ব্যতীত কাটাইতে পারে না।" তখন সক্রেটিশ বলিলেন, "হে বৎস, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। এখন এক কাজ কর: সোজা কবরখানায় যাও এবং একটি কবর খোঁড়। পূর্ব হইতেই একটি শবাধার ও শব ঢাকার জন্য একখানি চাদরও সংগ্রহ কর, তারপর যতবার ইচ্ছা নারীসঙ্গ কর এবং নিজের সর্বনাশ নিজেই ডাকিয়া আন। ইহাই তোমার প্রতি আমার অন্তিম উপদেশ।" সংযমী শিষ্য বিবাহিত জীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং সক্রেটিশের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্যরূপে পরিগণিত হইলেন।

অপরিণীত তরুণ-তরুণীদিগকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেয় যে, অসংযত জীবন যাপন পাশবিক ধর্ম। ব্রহ্মচর্য্যের বজ্র-বাণী বিবাহিত নর-নারীর কর্ণে এই অমৃতকথা ঘোষণা করে যে, সংযমকে দাম্পত্য প্রণয়ের ভিত্তি না করিলে ইহা পবিত্র ও গভীর হয় না, এবং দেহ-সুখের দাবী নৈতিক আদর্শের উপর স্থান পাইবে

না। মঁসিয় পল ব্যুরো মন্তব্য করেন, "প্রত্যেক প্রাকৃত যুক্তি-সঙ্গত পরিণীত জীবনে প্রেম ও ব্রহ্মচর্য্যের সাম্য প্রয়োজন। কারণ দাম্পত্য জীবনে উভয়েই অত্যাবশ্যক।" স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ "মানব জীবনের হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী" নামক ইংরাজি পুস্তকে মন্তব্য করেন, "পরিণয় মানবীয় দুর্বলতাকে কদাপি প্রশ্রয় দেয় না। ইহা সংযম সাধন ও অধ্যাত্ম উন্নতির শ্রেষ্ঠ পন্থা। বিবাহে সংগ্রামের অবসান হয় না, বরং ইহাতে কঠোরতর জীবনের আরম্ভ। দাম্পত্য জীবনে কামগন্ধহীন ও বিশুদ্ধ হইবার অসংখ্য সুযোগ পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রমতে বিবাহ দশবিধ সংস্কারের মধ্যে অন্যতম ও এবং পবিত্র। দেবতারাও বিবাহিত।"

মানবজীবনের হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও কাম-বাসনাকে নৈতিক উন্নতি ও ধর্মাদর্শ পালনের তীব্র চেষ্টার অনুগত রাখিতে হইবে। বিবাহ-সময়ে বর কন্যাকে এই বৈদিক মন্ত্রে সম্বোধন করিয়া বলে, "তাবেহি বিবাহাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ।" ইহার অর্থ, আমাদের দাম্পত্য মিলন যেন সুদৃঢ় হয় এবং আমরা যেন ব্রহ্মচর্য্য পালনে সাধ্যমত চেষ্টা করি। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রের (৫-৬১-৮) টীকাতে সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, "সকল ধর্মানুষ্ঠানে পতি ও পত্নী একত্রে যোগদান করিবে এবং সমান অংশ লইবে।" সেই জন্য হিন্দু শাস্ত্রে পত্নীকে সহধর্মিণী বলা হয়। বিবাহাদর্শের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই শব্দেই নিহিত।

সমাজ বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করিলে দেখা যায়, বিবাহ-সংস্কার ধর্ম ও নীতি বিষয়ে একটি সামাজিক চুক্তি। ইহার দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীরা পারস্পরিক প্রেম ও বিশ্বাসে এমন এক স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সম্মত হয় যাহা ইহলোকে, এমনকি পরলোকেও উচ্চতর মানুষ সৃজনে ও গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ফয়েরষ্টার মন্তব্য করেন, "ইহা সত্যই বলা যাইতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নরনারীর যৌন সম্বন্ধের উপর এমন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন যাহা সাধনলব্ধ রিপুসংযম দ্বারা বিবাহকে অধ্যাত্ম মিলনে পরিণত

করিয়াছে। ইহার ফলে দাম্পত্য প্রেম শ্রদ্ধা প্রীতি ও অচলা ভক্তির আকার ধারণ করে।"

—সতের—

সমাজ-বিজ্ঞানে ব্রহ্মচর্য্যের স্থান

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার 'রিলিজন ও ধর্ম' নামক ইংরাজি পুস্তকে (১৫৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মচর্য শুধু সন্ন্যাসীর জন্য নহে। কিংবা ইহা দেহেরও নহে। সুমহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত ব্রহ্মচর্য অর্থহীন ও অসম্ভব। লক্ষ্যহীন ব্রহ্মচর্য্য শক্তিক্ষয়ে পর্যবসিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্যকেও ক্রিয়াশীল করিতে হইবে। জীবনের যে দিক মানুষকে মানবরূপে বা আত্মারূপে দেখে তাহাকে কৌমার্য্য বা ব্রহ্মচর্য্য বলাই সঙ্গত। বিবাহ প্রথমতঃ নর ও নারীর মধ্যে চির বন্ধুত্বের স্থূল চুক্তি মাত্র। সদ্‌ভাব-বিনিময় এবং সহযোগিতাই আরাম ও আনন্দ দানের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। একটা যেন অন্যটাকে অস্বীকার না করে। ব্রহ্মচর্য্যেই নারীশিক্ষার ইঙ্গিত অব্যক্ত রহিয়াছে। পতি ও পত্নী প্রত্যেকে ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ করিলে দাম্পত্য প্রেমে যে উজ্জ্বল পবিত্রতা আসে তাহা জগতে দুর্লভ। শুদ্ধ ভাব ও শুভ জ্ঞানের বিনিময়ে এবং অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানে দাম্পত্য প্রেম বিশুদ্ধ হয়।"

ব্রহ্মচর্য্য পালন বিবাহিতনারীদেরও একটী প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাদের বিবাহের আদর্শ শুধু পত্নীত্ব বা মাতৃত্ব নহে। মার্কিন যুক্তরাজ্যের জনৈক ভূতপূর্ব

প্রেসিডেণ্ট একদা বলিয়াছিলেন, যে সকল দেশের নারীরা বিশ্বাস করে যে, সুপত্নী এবং সুমাতা হওয়া অপেক্ষা তাহাদের পক্ষে আরও কিছু কাম্য আছে তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ত্তমান যুগে বিবাহিত জীবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ মহাত্মা গান্ধী ও ঢাকার সাধু দুর্গাচরণ নাগ। মহাত্মা গান্ধী বলেন, "পরিণীত দম্পতীর হৃদয়কে কামমুক্ত ও বিশুদ্ধ করা এবং ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাওয়াই বিবাহের চরম উদ্দেশ্য। পতি পত্নীর মধ্যে নিষ্কাম প্রেম অসম্ভব নহে।' বিবাহের উদ্দেশ্য দৈহিক মিলন নহে, আত্মিক মিলন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণির দাম্পত্য জীবনে এই মহাসত্যই প্রকটিত। বিবাহ একটি সংযমের বন্ধন, একটি নৈতিক ধর্ম যাহা পারিবারিক ধর্মকে রক্ষা করে। বিবাহিত জীবনে নর-নারীগণ সর্বদা সতর্ক থাকিবে, অন্যথা দম্পতীর দেহ ইন্দ্রিয়-লালসার ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইবে। যদি ব্রহ্মচর্য্য বিবাহিত জীবনের ভিত্তি হয় তাহা হইলে দম্পতীর জীবন আত্মানুভূতির দেবমন্দিরে পরিণত হয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, তীব্র কর্মজীবনের মধ্যেও তিনি ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্বক প্রচুর সাফল্য লাভ করিয়াছেন। পতি ও পত্নী যতই দেহ-সুখের দাবী বা অনঙ্গের তাড়না প্রত্যাখ্যান করেন ততই দাম্পত্য প্রেম প্রগাঢ় ও বিশুদ্ধ হয়। কেবলমাত্র সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে পরিণীত দম্পতী ব্রহ্মচর্য্য-ভঙ্গ করিতে পারেন। দেহ-সুখের জন্য ব্রহ্মচর্য্য-ভঙ্গ মহাপাপ। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের জীবন উক্ত আদর্শের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চতম আদর্শ পালনের সহিত জাতির সংরক্ষণ ও বংশরক্ষা কামনায় যৌনক্রিয়া অসমঞ্জস নহে। কিন্তু সাধু সাবধান! সন্তান কামনা যেন সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া না দেয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,

ঋতাবতৌ স্বদারেষু সঙ্গতির্যা বিধানতঃ
ব্রহ্মচর্যং তদে বো ক্তং গৃহস্থাশ্রমো-বাসিনাম্।

অনুবাদ—শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে সন্তান কামনায় ঋতুকালে স্বীয় ধর্ম্ম-পত্নীর সহবাস গৃহস্থ নরনারীগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য বলিয়া কথিত। মনু সংহিতায় আছে—

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শঃ স্মৃতঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্ধমহভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ ॥
তাসামাদ্যা চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তাঃ দশরাত্রয়ঃ ॥

অনুবাদ—নারীদের ঋতুকালে প্রত্যেক মাসে ষোল দিনের পরে চার দিন স্ত্রীসঙ্গের অনুকূল কাল নহে বলিয়া সজ্জন কর্তৃক নিন্দিত। এই ষোল দিনের মধ্যে প্রথম চারদিন এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ দিবস স্ত্রীসঙ্গের পক্ষে প্রশস্ত নহে? এই ছয় দিন ব্যতীত অবশিষ্ট দশ দিন এতদুদ্দেশ্যের অনুকূল।

এই দশ দিনের মধ্যে প্রতিপদ, ষষ্ঠী, অষ্টমী, একাদশী, দ্বাদশী, চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা তিথি এবং এতদ্ব্যতীত চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ, রামনবমী, শিবরাত্রি জন্মাষ্টমী, শ্রাদ্ধদিবস জন্মদিন ও রবিবার স্ত্রীসঙ্গ বর্জনীয়। অবশিষ্ট দিনগুলির মধ্যে মাত্র দুইদিন স্ত্রীসঙ্গ বিধেয়এবং তাহাও পত্নীর অনুমতি লইয়া ও আন্তরিক উপাসনাদির পর কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহাকে গৃহস্থ ব্রহ্মচারী বলা যায়। উক্ত মর্মে মনুস্মৃতিতে আরও আছে—

নিন্দাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জয়ন্।
ব্রহ্মচর্যৈব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্ ॥

অনুবাদ—প্রথম ছয় এবং তৎপরে আট রাত্রি মোট চৌদ্দ রাত্রি বাদ দিয়া যিনি মাসে মাত্র দুই দিন পত্নী গমন করেন তাহাকে গৃহস্থাশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী বলা যায়।

মহাভারত বলেন, "ভার্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ।"

অর্থাৎ পত্নীর ঋতুকালে যে গৃহস্থ মাসে দুই বারের অধিক স্ত্রীসঙ্গ করেন না তাহাকে ব্রহ্মচারী বলা চলে।

পতি তাহার পত্নীকে জগদম্বার মূর্তিজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিবে। পত্নীও পতিকে স্বীয় ইষ্টদেবের জীবন্ত বিগ্রহ বোধে পূজা করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার ব্রহ্মচারিণী পত্নী সারদাদেবী পরস্পরকে উক্তভাবে দেখিতেন। কামান্ধ হইয়া পতি ও পত্নী পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত বা পরস্পরকে স্পর্শ করিবে না। ব্রহ্মচর্যের বিধি ইহা নহে যে, কোন অবস্থায় কেহ তাহার পত্নী বা ভগ্নী বা অন্য কোন নারীকে স্পর্শ করিবে না। যখন কোন পুরুষ কোন রমণীকে স্পর্শ করিবে তখন তাহার মন জননীকে প্রণাম করার সময় যেমন সুশান্ত ও সংযত থাকে তেমনি থাকিবে।

ব্রহ্মচারী হইলেও কেহ রুগ্না সহোদরা বা জননীকে শুশ্রূষা করিতে ইতস্তত করিবে না। যেমন মৃত দেহের সংস্পর্শে মনে কোন বিকার জন্মায় না তেমনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণীকে স্পর্শ করিলেও আমাদের মনে কোন উত্তেজনা যেন না আসে। অপ্সরীতুল্যা কোন সুন্দরী নারীকে দেখিয়াও যেন আমরা আকৃষ্ট না হই। নারীতে মাতৃবুদ্ধি দ্বারা উক্ত উত্তেজনা বা আকর্ষণ বিনষ্ট হয়। বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য পালনে সাফল্য লাভের উপায় জাগ্রত ও সুপ্ত মনের ভাবরাশির বিশুদ্ধি করণ। স্বপ্নেও যেন কেহ মনে অসৎচিন্তা প্রশয় না দেন। প্রত্যেক অসৎচিন্তা পরোক্ষে ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ বা মাৎসর্য যে কোন রিপুর আক্রমণেই ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়। অসৎচিন্তা মন ও শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে। কিন্তু ভাবরাশি বিশুদ্ধ ও সংযত হইলে অসীম মনঃশক্তি উদ্ভূত হয়। যেমন কোন ছিদ্রযুক্ত পাত্রে উত্তপ্ত বায়ু রাখিলে কোন শক্তি সৃষ্ট হয় না তেমনি বিক্ষিপ্ত মনে শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় না। ক্রিয়া চিন্তার স্থূল রূপ। সুতরাং কামচিন্তা কাম-ক্রিয়ারই সূক্ষ্ম রূপ। মন সংযত হইলে কাম-জয় ও ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কামজয়ী অনন্ত আনন্দের অধিকারী হন।

স্বামী ত্রিগুণাতীত দৃঢ়ভাবে বলেন, "ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ অনুভব করে যে, তাহার হৃদয়স্থিত আনন্দ-সাগর দেহের নবদ্বার দিয়া উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তখন প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া অসীম আনন্দ অনুভূত হয়। তখন বোঝা যায়, পূর্বানুভূত অন্য সমস্ত আনন্দ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।"

আঠার

ব্রহ্মচর্য্য ও সমাজ

ডাঃ জে. ডি, আনউইন "যৌনতা ও সংস্কৃতি" নামক যে ইংরাজি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে একটী অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ। আনউইনের সিদ্ধান্তসমূহ সযত্নে সংগৃহীত প্রমাণরাশির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, "সকল মানব সমাজ একটা না একটা সাংস্কৃতিক অবস্থায় বিদ্যমান। এই সকল সমাজের মধ্যে কোনটা সর্বাপেক্ষা অল্প মানসিক ও সামাজিক উদ্যম প্রকাশ করে; কিন্তু আবার তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্তিবাদী হয়। গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে সমাজ সর্বাপেক্ষা অল্প উদ্যমশীল তথায় অবিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধি প্রচলিত নাই, এবং বিবাহিত জীবনে যৌন প্রশ্রয়ের সুযোগ সর্বাপেক্ষা অধিক। যতই অবিবাহিত ও বিবাহিত জীবনে যৌন সম্ভোগের উপর কঠোর বিধি কার্য্যকরী হয় ততই সমাজের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবস্থা উন্নত হয়। যে সমাজে যৌবনে

ব্রহ্মচর্য্য পালন ব্যাপক ও বাধ্যকরী তাহার ভাব, কার্য্য ও উন্তম অতুলনীয় ও অপরিসীম।"

আনউইনের মতে সমাজের মধ্যে যে শ্রেণী ব্রহ্মচর্যের সমধিক পক্ষপাতী তাহাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং তাহাই সমাজকে চালিত ও শাসিত করে। সেই শাসক শ্রেণীই সমগ্র সমাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের অন্ততঃ একটী শ্রেণী যদি কুমার-কুমারীদিগকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষিত করে এবং বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করিয়া একমাত্র বিবাহকেও ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ করে তবেই সমাজ সভ্যতার বিমল আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

সামাজিক ব্রহ্মচর্য পালনে যে প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্ট হয় তাহা ব্যাপকভাবে সমগ্র সমাজকে বলিষ্ঠ ও উন্তমী করে। যেখানে কঠোর যৌন সংযম পুরুষানুক্রমে সাধিত হয় সেখানে সমষ্টিগত শক্তি উচ্চতর সংস্কৃতির সৃষ্টি করে। সৃজনী শক্তি কিছুকাল স্থায়ী হইলে সমাজে সমৃদ্ধ শালীনতা ও যাথার্থ্যবোধ উৎপন্ন হয়। যে সমাজে যৌন সুযোগ অতিশয় হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তথায় সৃজনশীল সামাজিক শক্তি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। উক্ত প্রথা রক্ষিতওপালিত হইলে উচ্চতর এবং আরো উচ্চতর সভ্যতা ও কৃষ্টি উৎপন্ন হয়। কখন কখন কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সমুচ্চ সংস্কৃতির সুবিধা উপভোগ এবং তৎসঙ্গে বাধ্যকরী ব্রহ্মচর্যের বিলোপ করিতে চাই। মানব দেহের আন্তর প্রকৃতি এমনই ভাবে গঠিত যে, এই দুই প্রকার কামনা একইসঙ্গে একমনে যুগপৎ উঠিতে পারে না। এই দুইটি কামনাকে পরস্পর-বিরোধী বলিলেও ভুল হইবে না। এই দুইটির একটিকে মনোনীত করিবে। অবিসংবাদিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, কোন সমাজ এই উভয় সুযোগ এক পুরুষের বেশী ভোগ করিতে পারে না। ডাঃ আনউইন পরামর্শ দেন যে, বর্তমান জগৎ দুইটি বিকল্পের সম্মুখীন। ইহা ব্রহ্মচারী ও উন্তমশীল হইবে, কিংবা ইহা ব্যষ্টি ও সমষ্টি শক্তির বিনিময়ে যৌন প্রশ্রয় বরণ করিবে।

মঁসিয় পল ব্যুরো তাঁহার অতিশয় চিত্তাকর্ষক পুস্তক 'নৈতিক অবনতির অভিমুখে', নামক ফরাসী গ্রন্থে আধুনিক জীবনে দোষত্রুটির মূল কারণ

অনুধাবনপূর্বক উপসংহার করেন যে, সমসাময়িক সমাজের মহাব্যাধি যৌন প্রশ্রয় ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তিনি এই নিয়ম বিধান করিয়াছেন যে, জাতিসমূহের সুখ ও সম্পদ ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও চরিত্রের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কোন স্থায়ী সুখ ও পরম কল্যাণ লাভ হয় না, যদি অবিবাহিত ও বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত না হয়। আল্‌ডাস হাক্সলি মন্তব্য করেন যে, অসৎ পথের পথিককেই অসৎ চিন্তা ও কার্য অবনত করে। অসৎ চিন্তা ভোগ দ্বারা তৃপ্ত হয় না। প্রশ্রয় পাইলে ইহা ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসে। ইতালীয় সন্ত ব্রাদার গাইল্‌স তাঁহার উপদেশাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "সকল সদ্‌গুণের মধ্যে পবিত্রতাই প্রথম কারণ এবং মধুর পবিত্রতার মধ্যে সকল পূর্ণতা নিহিত। কিন্তু পবিত্রতা ব্যতীত এমন কোন সদ্‌গুণ নাই যাহা মানুষকে পূর্ণ করিতে পারে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যখন কেহ বীর্য্যধারণে সমর্থ হয় তাহার মেধাশক্তি বাড়ে। সেই মেধার দ্বারা ব্রহ্মানুভূতি হয়। যেমন কাচে পারা লাগাইলে যে কোন বস্তুর চিত্র ইহাতে পড়ে তেমনি উক্ত মেধায় ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিফলিত হয়।"

মনুস্মৃতিতে আছে, বীর্যধারণে চারিত্রিক সংশুদ্ধি ও মানসিক মাধুর্য্য বর্ধিত হয়। মহাভারতে পাওয়া যায়, নারদ মুনি শুকদেবকে বলিতেছেন, বিবাহ না করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমী হও। গুরু নানক 'জপ্‌জী' গ্রন্থে বলেন, "ব্রহ্মচর্য্য রূপ অগ্নিকুণ্ডে মন বিশুদ্ধ হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়।" সর্বদেশের সর্বশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের অপার মহিমা মুক্ত কণ্ঠে কীর্তিত। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৬।৭) বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্যই জ্ঞানলাভের তিনটি মার্গের অন্যতম।

———

—উনিশ—

তরুণ ভারতের সম্মুখে কর্তব্য

ব্রহ্মচর্যের অভাবে আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা ক্রমশঃ দৈহিক দুর্বলতা ও মানসিক অক্ষমতায় পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। কোন পাশ্চাত্য ডাক্তার বলেন যে, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, বিশেষত স্মৃতিশক্তির হ্রাস, ব্রহ্মচর্যহীন ব্যক্তিদের জীবনেই আসে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংযুক্ত বিবরণীতে পাওয়া যায়, ভারতের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী কোন না কোন রোগে আক্রান্ত। ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক স্বাস্থ্যের এই ভয়ঙ্কর অবস্থার একটি কারণ নেতৃস্থানীয় চিকিৎসকদের মতে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, বীর্যধারণে অনিচ্ছা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কলেজের ভূতপূর্ব পরিদর্শক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন রোগের বৃদ্ধি প্রতিকারার্থ আবেদনপূর্বক মন্তব্য করেন, "কিছুকাল যাবৎ আমি অতিশয় দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র ক্রমশঃই হীন হইতে হীনতর হইতেছে। যখন তিনি শেষবার কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন তখন তিনি ডাক্তারদের নিকট হইতে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পান, উক্ত কলেজের আউট ডোর ডিস্‌পেন্‌সারিতে যে সকল যৌন রোগ চিকিৎসিত হয় তাহাদের অধিকাংশই স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট হাউস হইতে ১৯৩০ খ্রীঃ ৫ই জুন উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। বাংলার স্বাস্থ্যদপ্তরসমূহ সংবাদ দিয়াছিল যে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৭৫জন স্বাস্থ্যহীন। বিশেষতঃ, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য। বোম্বাইয়ের স্বাস্থ্যদপ্তর-সমূহের মতে করাচীর শতকরা ৯০জন ছাত্রছাত্রী স্বাস্থ্যশূন্য। বিভিন্ন দেশে পুরুষরাই প্রধানতঃ যৌনভাবে এত অভিভূত যে, তাহাদের প্রাত্যহিক জীবন উহার দ্বারা

কলুষিত। তাহারা প্রায় সর্বদাই নারীর কথা বলিতে ও ভাবিতে ভালবাসে। এই দুরবস্থা শুধু যে ভারতে বিগুমান তাহা নহে; ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশেও ইহা ব্যাপক।

জার্মান দার্শনিক চোপেনহাওয়ার যে শহরে বাস করিতেন তথায় সৈন্যদলের অফিসারদের সহিত এক হোটেলে তিনি খাইতেন। তথায় তিনি আহারকালে একটি স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার থালার পাশে রাখিয়া দিতেন। যদি অন্য কোন যাত্রী নারীপ্রসঙ্গ না করিয়া আহার শেষ করিতেন তাহা হইলে প্রথমদৃষ্ট দরিদ্রকে তিনি উক্ত স্বর্ণমুদ্রাটি দান করিতেন। উক্ত দার্শনিক বহু মাস যাবৎ ঐ স্বর্ণমুদ্রাটি কাহাকেও দিতে পারেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, নারীপ্রসঙ্গ অধুনা সমাজে সর্বত্র কত পরিব্যাপক। অথর্ববেদ ঘোষণা করেন, "ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুম্ উপাঘ্নত।" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পালন ও তপশ্চর্যার দ্বারা দেবতাগণ মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ ও কৌরবদের পিতামহ ভীষ্মদেব ব্রহ্মচর্য পালনের বলেই পিতার বরে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছিলেন। যাহারা অন্ততঃ চৌদ্দ বৎসর অষ্ট প্রকার মৈথুন হইতে বিরত থাকেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য কেহ অজেয় ইন্দ্রজিৎ-বধে সমর্থ হন না। ব্রহ্মচর্যবলেই হনুমান গন্ধমাদন পর্বত বহন বা সমুদ্রলঙ্ঘনাদি অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্যবলে স্বামী দয়ানন্দ জনৈক মহারাজার শকট রোধ করেন এবং স্বহস্তে তরবারী ভঙ্গ করিতে সমর্থ হন। সেইরূপ, ব্রহ্মচর্যবলে মহারাষ্ট্রের ধর্মগুরু জ্ঞানদেব পঞ্চভূতকে স্বীয় আদেশ পালন করাইতে সমর্থ হন। সর্বদেশের লোকসাহিত্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, অকৃতদার ব্যক্তিগণই অপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী হন। ওয়েষ্টারম্যাক এই মত পরিপোষণ, করেন যে কলুষীকরণ দুর্লভ পবিত্রতাকে বিনষ্ট করে।

রিওনিগ্রো নদীতীরে কোন উপজাতি তাহাদের চিকিৎসকগণকে ব্রহ্মচর্য পালনে বাধ্য করাইত।- কারণ, তাহাদের বিশ্বাস ছিল, বিবাহিত ব্যক্তি ঔষধ বিধান করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। স্বাস্থ্য ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

হইলে সহজে কঠিন ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্যহীন ব্যক্তিগণ ব্যাধির আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মচারীর দেহ বলিষ্ঠ, মন সুস্থ, চক্ষু দীপ্তিশালী, গণ্ডদেশ প্রভাময় এবং মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত থাকে। আধুনিক তরুণ-তরুণীরা অতিরিক্ত সৌন্দর্য-চর্চার খেয়ালে প্রমত্ত। তাহাদের এই বিশ্বাস বর্ধিত হউক যে, সর্বপ্রকার সৌন্দর্য এমন কি বাহ্য সৌন্দর্যের মূল কারণ বীর্যধারণ। প্রাচীন ভারতের গুরুকুলে বালকগণ স্বাস্থ্যবান্ ও দীর্ঘজীবী ছিল।

অবশ্য সংশোধনের সময় এখনো অতিক্রান্ত হয় নাই। যদি আমরা এখনও ব্রহ্মচর্যের সৃজনী শক্তিতে বিশ্বাসী হই তাহা হইলে আমরা শুধু ব্যক্তি-গত জীবন নহে, পরন্তু সমষ্টিগত জীবনও অভূতপূর্ব উপায়ে পুনর্গঠিত করিয়া সুখশালী হইতে পারি। শাস্ত্রে আছে—

আরভেতৈব কর্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ।
কর্মাণি আরভমানং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে॥

অনুবাদ—বার বার ক্লান্ত ও বিফল হইলেও কর্তব্য কর্ম সাধ্যমত করা উচিত। কারণ কর্মারম্ভে নিষ্ঠাবান্ হইলে পুরুষ সাফল্য মণ্ডিত হয়।

মার্কিন কবি লংফেলো সত্যই বলিয়াছেন, "যে কর্তব্য কর্ম আরম্ভ করিয়াছ তা সমাপ্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হও। যদি ক্লান্ত হইয়া পড় নবোদ্যমে পুনরায় চেষ্টা কর। যদি আবার পরিশ্রান্ত হও আরও একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। এইরূপে জীবন-সংগ্রাম করিলে সাফল্য ও সৌভাগ্য নিশ্চয়ই তুমি লাভ করিবে। যে ব্যক্তি তার শ্রম ভাল ভাবে আরম্ভ করে এগিয়ে যায় সে সুখী, অতিসুখী হয়। সে কখন কর্তব্যবিমূঢ় ও বিফলমনোরথ হয় না। সময় এবং সুবিধার জন্য অলসভাবে অপেক্ষা করিলে সাফল্য সুদূরেই থাকে।" অন্য এক মনীষি এই ভাবে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, "তোমার চেষ্টা সত্যই ঐকান্তিক কি? যদি তাহাই হয় এই মুহূর্তে তোমার কর্তব্য কর্ম আরম্ভ কর, বা উচ্চ লক্ষ্যের স্বপ্ন দেখ। সাহসিকতার মধ্যে

প্রতিভা ও ইন্দ্রজাল আছে। কেবল কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত হও, তাহলে মন একাগ্র হইবে। একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করিলে সমাপ্তি ও সাফল্য অবধারিত। এমন কোন বাধা নাই যা তুমি অতিক্রম করিতে পার না এমন কোন মহৎ লক্ষ্য নাই যা তোমার পক্ষে লাভ করা অসম্ভব। সমস্ত বিজয় ভবিষ্যতে তোমারও হতে পারে। তোমার যে দোষ আছে সেগুলি দূর করবার চেষ্টা কর। কিন্তু সত্য-যষ্টির উপর নির্ভর করাই শ্রেয়। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যা তুমি দাবী করতে পার না। তোমার আত্মশক্তির সম্মুখে কোন প্রাচীর অলঙ্ঘ্য থাকিবে না।"

বিশ

উপসংহার

আপস্তম্ব মুনি তাঁহার 'ধর্মসূত্র' গ্রন্থে (১:৫।১) স্পষ্টভাবে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন "গৌরবময় অতীত কালে নর-নারীরা যেমন ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী পালন করিত তদ্রূপ অধুনা করে না বলিয়াই পরবর্তী যুগে মুনি-ঋষি এদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। সত্যপালন ও তপশ্চর্য্যার অভাবে মুনি-ঋষির বংশধরগণ পশুত্বের ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। উপনিষদেএকটি শ্লোক আছে যাহার গূঢ়ার্থ অনেক আধুনিক মনীষি এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "কেবল মাত্র অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারাই এবং অন্য কোন তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান না করিয়াও পরম সত্যের

সম্যক্ অনুভূতি সম্ভব।" পরম পুরুষার্থ লাভের পক্ষে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনই প্রধান সাধন। মধ্যযুগের কোন জৈন সাধু উক্তভাব নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন—

প্রাণভূতং চরিত্রস্য পরব্রহ্মৈককারণম্।
সমাচরন্ ব্রহ্মচর্য্যং পূজিতৈরপি পূজ্যতে॥

অনুবাদ—চরিত্রই মানুষের প্রাণস্বরূপ এবং ব্রহ্মলাভের উত্তম উপায়। যিনি সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন তিনি সমাজের পূজিত ব্যক্তি দ্বারাও পূজিত হন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ জগৎপূজ্য। তাঁহারাই সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। প্রাচীন ভারতের ন্যায় বর্তমান স্বাধীন ভারতের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রচেষ্টা ব্যাপক হওয়া দরকার। তাহা হইলে মহাভারত আবার সগৌরবে জগৎমধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে। হরি ওঁ তৎ সৎ।

একুশ

কতিপয় স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

মলমূত্র ত্যাগের সময় দুই পাটি দাঁত চাপিয়া ধরা উচিত। এইরূপ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত দাঁত পড়িবে না, বা নড়িবেও না। নুন-তেল বা নিমের দাঁতন দিয়া দাঁত মাজা উত্তম।

মলত্যাগের সময়ে বা আহার কালে ডান নাক দিয়া নিশ্বাস বহাইবে। মূত্রত্যাগ বা জলপানের সময় বাম নাক দিয়া নিশ্বাস বহিলে ভাল। ইহাতে দেহ অজীর্ণ ও উদরাময়াদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না।

আহারান্তে কিয়ৎকাল বীরাসনে উপবেশন করিলে বাতের প্রকোপ কমিয়া যায়। প্রাতে শয্যাত্যাগের পর উষাপান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। নৈশ আহারান্তে শয়নের পূর্বে জলপানেও কোষ্ঠবদ্ধতা সারিয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, "শিরঃ প্রাবৃত্য বাসনা, বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছাসবর্জিতঃ কুর্য্যাৎ মূত্রপুরীষে তু শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।" অর্থাৎ কাপড়ে মস্তক ঢাকিয়া, মুখ বন্ধ রাখিয়া, থুথু ফেলা বন্ধ করিয়া, পরিষ্কার জায়গায় বসিয়া মল বা মূত্র ত্যাগ করিবে। মলমূত্র ত্যাগকালে নাকে ও চোখে একখানা কাপড় জড়াইয়া রাখা ভাল। তখন নিঃশ্বাস লওয়া বা থুথু ফেলা অনিষ্টকর। কলিকাতায় বা অন্যান্য সহরে মলমূত্র ত্যাগার্থে যে সব সাধারণ স্থান আছে সেগুলি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সেইগুলিতে মলমূত্র ত্যাগ করিলে কঠিন ব্যাধির সংক্রমণের সম্ভাবনা আছে।

প্রাতে সর্বাগ্রে মলত্যাগ ও দন্তধাবন কর্তব্য। টুথ ব্রাস ব্যবহার করিবে না। কারণ ব্রাসের চুল এক টুকরা যদি পেটে চলিয়া যায় তাহা মহা অনিষ্ট সৃষ্টি করিবে। আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজন, লবণ-চূর্ণ বা পরিষ্কার গঙ্গামাটি দিয়াও দাঁত মাজা যায়। বালিগুড়া বা কয়লা চূর্ণ ব্যবহার করিবে না। কারণ ইহাতে দাঁতের এনামেল নষ্ট হইয়া যায়। পদ্মপুরাণে আছে—

তৃণাঙ্গারঃ কপালাশ্মৈ বালুকায়সচর্মভিঃ।
দন্তধাবনকর্তারঃ ভবন্তি পুরুষাধমাঃ ॥

অনুবাদ—যাহারা খড়, ছাই, বালি, চামড়া, মাটি বা পাথরের চূর্ণ দিয়া দাঁত মাজিয়া থাকে তাহারা অধম।

ক্যালসিয়াম দাঁতকে শক্ত রাখে। যাহাদের দাঁত খারাপ তাহারা প্রাতে বা সন্ধ্যায় চার গ্রাম ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট বা ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দুধ বা জলের সহিত ব্যবহার করিবেন। দাঁত, জিভ ও মুখ প্রত্যহ নির্মল জলে ধুইয়া পরিষ্কার রাখিবে। নৃসিংহ পুরাণে আছে, "অপানদ্বাদশগণ্ডুষৈঃ মুখ-শুদ্ধিঃ বিধীয়তে।" অর্থাৎ দন্তধাবনান্তে প্রত্যহ সকালে দশ বার মুখ ধুইবে।

প্রত্যহ শ্বেত কৃষ্ণ ও পীত বর্ণ ধ্যান করিলে যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্য থাকে। ত্রিদোষের অভাবই স্বাস্থ্যবর্ধক। নাভিকমলে অগ্নিধ্যান করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। ভ্রূযুগলের মধ্যে জ্যোতিঃধ্যান করিলে আয়ুবৃদ্ধি হয়।

রোগাক্রমণের আভাস পাইলে নিশ্বাস অন্য নাকে বহাইবে। ইহা দ্বারা রোগের ভোগকাল কমিয়া যায়। যে নাকে নিশ্বাস বহাইতে হয় তাহার বিপরীত দিক চাপিয়া শুইবে। তখন নিশ্বাস এক নাক ছাড়িয়া অন্য নাকে চলিবে। তুলা বা কাপড় দিয়া নাক বন্ধ করিলেও নিশ্বাসের গতি পরিবর্তিত হয়।

দিবাভাগে বাম নাকে, রাত্রিকালে ডান নাকে নিশ্বাস বহাইবে। সকালে ও সন্ধ্যায় উভয় নাকে নিশ্বাস বহা ভাল। এইরূপে নিশ্বাস বহাইলে চিরতারুণ্য, রোগরাহিত্য ও দীর্ঘজীবন লাভ হইতে পারে।

শীতকালে রাত্রে শয়নের পূর্বে গরম জল এবং গরম কালে ঐ সময় ঠাণ্ডা জল পান করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারিত হয়।

নৈশ আহার লঘু হওয়া উচিত। মধ্যাহ্ন ভোজন গুরু হইলেও ক্ষতি নাই। সন্ধ্যার পরে দুই ঘণ্টার মধ্যে নৈশ ভোজন শেষ করা উচিত, কারণ শয়নের পূর্বে ভুক্ত দ্রব্য অন্তত অর্ধ পরিপাক হওয়া দরকার। রাত্রে গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ ও দুঃস্বপ্ন ও স্বপ্নদোষাদি রোগ হয়। ডাঃ বেল বলেন নৈশ আহারকে সান্ধ্য ভোজনে পরিণত করাই শ্রেয়। কারণ প্রাতঃকালীন মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ্য, দৈহিক ভারবোধ প্রভৃতির জন্য ইহাই প্রধানতঃ বা প্রায়শঃ দায়ী।

মনুসংহিতায় আছে—

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥

অনুবাদ—যাহা অন্যের অধীন তাহা দুঃখকর। যাহা আত্মাধীন তাহা সুখকর। সুখ ও দুঃখের ইহাই সরল সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা।

যখন দেহ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান্ থাকে তখন উহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার

করা যায় এবং তখনই ইহা আত্মবশ থাকে। কিন্তু যখন স্বাস্থ্য ভগ্ন ও শক্তি নষ্ট হয় তখন উহা যেন পরাধীন হইয়া যায়, আর আত্মাধীন থাকে না। শরীরকে নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান্ রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্যই স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভের উত্তম পন্থা। কষ্টকর হইলেও এই পরীক্ষিত পথে চলা উচিত। সুখকর হইলেও অসৎপথে চলা অনুচিত। ব্রহ্মচর্য পালন কষ্টকর হইলেও শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পন্থা আর নাই।

বাইশ

পরিশিষ্ট

মন ও স্বাস্থ্য*

মনের সহিত স্বাস্থ্যের যে নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা যতটা বলি ততটা বুঝি না, বা বিশ্বাস করি না। যোগশাস্ত্রে মনের শক্তিতে রোগ আরোগ্য করিবার উপায় লিখিত থাকিলেও যোগিগণ ভিন্ন সকলে এই শক্তি লাভ করিতে পারে না। এইজন্য উহা সাধারণের সম্পত্তি না হইয়া মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই আবদ্ধ আছে। ক্রীশ্চান সায়েন্স, নিউ থট, প্রভৃতি সম্প্রদায় পাশ্চাত্যে মানসিক চিকিৎসা (mental healing) সমাজে প্রচার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী নহে বলিয়া ফল আশানুরূপ হয় নাই। বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞানের সাইকো

(* বঙ্গলক্ষ্মী। আশ্বিন, ১৩৪৫) পত্রিকায় প্রকাশিত।

এনালিশিস শাখা এই চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। ফ্রয়েড, এ্যাডলার ও জুং প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এই উপায়ে বিশেষ ভাবে স্নায়ুরোগ আরোগ্য করিতেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক এমিল কুয়ের মানসিক চিকিৎসা প্রণালী বিবৃত করিব।

এমিল কুয়ে প্রথম জীবনে চিকিৎসক ও পরে হিপনোটিষ্ট হন। তিনি এই অভিনব প্রণালী সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল গবেষণার ফলে উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি নিরামিষাশী ও বহু বৎসর যাবৎ এইরূপ চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু তিনি কখনও কাহারও নিকট হইতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। গ্রীকদেশীয় যোগী সক্রেটিস বলিয়াছেন, মানুষের যত শক্তি আয়ত্ত হয় তাহার মধ্যে পরোপকার সাধনরূপ শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কুয়ের জীবনে এই শ্রেষ্ঠ শক্তি যেন মূর্তিগ্রহণ করিয়াছে। তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন ও সম্পদ অপরের দুঃখকষ্ট নিবারণে উৎসর্গ করিয়াছেন। আটলাণ্টিক মহাসাগরের উভয় পার্শ্বে তাঁহার এত সুখ্যাতি যে, তাঁহার নামে নানা সহরে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষাবিজ্ঞান ও অপরাধতত্ত্বে তাঁহার মতবাদের দ্বারা এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ফরাসীদেশের সংশোধনাগারসমূহে (reformatories) এই প্রণালী প্রবেশ করিয়া শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ অপরাধীদের ভাল লোক করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে নানা ভাষায় অনেক পুস্তকও দেখা যায়। এমিল কুয়ের একটি নাম মনোবিজ্ঞানে হেনরী ফোর্ড (Henry Ford of Psychology); আর একটিনাম 'সুখবাদের আচার্য্য (Apostle of optimism)। কারণ, স্বাস্থ্য ও সুখ লাভের সুগম পথ এইযুগে তাঁহার মত আর কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাঁহারপ্রণালীর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা সকলকে স্ব স্ব শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি আরোগ্য করিবার কৌশল শিক্ষা দেয়। তাঁহার মতে দেহ ও মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ ও রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেককেই নিজের চিকিৎসক হওয়া দরকার। আরোগ্যশক্তি মানুষের মনে সুপ্ত অবস্থায় আছে। ঔষধ প্রয়োগে

সেই শক্তি জাগ্রত বা বর্ধিত হয় মাত্র। কিন্তু সেই শক্তিই মানুষকে নিরাময় করে, ঔষধ নহে। তাই বিখ্যাত ডাক্তারগণও আর ঔষধের উপর বেশী বিশ্বাস স্থাপন করেন না। বিখ্যাত ডাক্তার অসলারের মতে ঔষধে যত লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে যুদ্ধেও তত লোকের মৃত্যু হয় নাই। সেই জন্য হোমিওপ্যাথি এবং বাইওকেমিক এলোপ্যথির মত অধিক ঔষধ প্রয়োগ করে না। হোমিওপ্যাথি ও বাইয়োকেমিকের জন্মভূমি জার্মানি হইতেই এক প্রতিভাবান ডাক্তার প্রচার করিলেন যে, ঔষধমাত্রেই শরীরের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক করে। প্রাকৃতিক চিকিৎসা দেহমনের অশেষ হিতকারী। হ্যানিম্যান ও শশলারের প্রতিবাদ করিয়া লুইস্ কুনে বলিলেন, "পঞ্চভূতেরদ্বারা শরীর গঠিত। তাহাদের সাহায্যেই মানুষ ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পারে।" লুইস কুনের মতে জল, মাটী, আলো ও বায়ুরদ্বারা চিকিৎসাও বাংলায় ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। তিনি সর্বরোগের ঐক্য দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন এক প্রকার চিকিৎসাতে (unity of treatment) সমস্ত রোগ আরোগ্য করা যায়। তিনিআরওবলেন যে, তাহার প্রণালী সকল রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ; কিন্তু সকল রোগীকে নহে। কারণ রোগীর জীবনী শক্তি না থাকিলে কোন চিকিৎসায় আরোগ্য অসম্ভব।

কুনে ঔষধে অবিশ্বাসী হইলেও তাঁহার প্রণালী কোন চিকিৎসার পরিবর্তে প্রয়োগ করিতে চান না। ঔষধ রোগ আরোগ্য করিতে অধিক সময় নেয়। এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, এমনকিঅস্ত্রচিকিৎসার সঙ্গেও তাঁহার প্রণালী প্রয়োগ করা যায়। তাহাতে আরোগ্যের গতি দ্রুত হইবে। তবে যদি কেহ কেবলমাত্র তাঁহার প্রণালীই গ্রহণ করেন তাহাতেও তিনি যাপনীয় (chronic) ও কঠিন (serious) রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। কুনের প্রণালী ভালরূপে বুঝিতে হইলে মনোবিজ্ঞান কিঞ্চিৎ জানিতে হইবে। মনের সচেতন বা জাগ্রত অবস্থা ব্যতীত একটা নিম্নতর আছে। তাহাকে অচেতন বা সুপ্ত অবস্থা বলা যাইতে

পারে। ভারতীয় মনস্তত্ত্বে সুপ্ত মনের কার্য্যাবলী বিশেষ ভাবে আবিষ্কৃত হইলেও পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্বে মনের এই স্তর এতকাল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফ্রয়েডের মত কুয়ে বলেন, জাগ্রত মনের গতিবিধি সুপ্ত মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মনকে সমুদ্রে ভাসমান বরফের পাহাড়ে সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। বরফের পাহাড় যখন সমুদ্রে ভাসিতে থাকে, তখন উহার আট ভাগের সাত ভাগ নীচে নিমজ্জিত এবং মাত্র এক অষ্টমাংশ জলোপরি ভাসমান থাকে। জলমধ্যস্থিত অংশকে সুপ্ত মন এবং জলোপরিস্থিত অংশকে চেতন মনের সহিত তুলনা করা হয়। আমরা এতদিন এই ভ্রান্ত ধারণার অধীন ছিলাম যে, জাগ্রত মনই সুপ্ত মনকে নিয়মিত করে। প্রকৃত পক্ষে তাহা সত্য নহে, মানব-জীবন সুপ্ত মনের হাতের পুতুল মাত্র। বিশ্ববিশ্রুত মনস্তত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ম্যাকডুগাল বলেন, সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার লক্ষ্য ও শক্তি এই সুপ্ত মনই নির্দেশ করে। জনৈক লেখকের মতে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার যেমন জগতের দৃষ্টি আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলের অভিমুখী করিয়াছে তেমনি সুপ্ত মনের আবিষ্কার এবং উহার ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা মানব জীবনে গভীর পরিবর্তন এবং শিক্ষা ও সাধনায় যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

সুপ্ত মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে বেশী সময় লাগে না। জাগ্রত মন নিদ্রাকালে নিদ্রিত হয়; কিন্তু মন নিদ্রিত অবস্থাতেও জাগ্রত থাকে। নিদ্রাকালীন স্বপ্নই উহার প্রমাণ। স্বপ্ন উক্ত মন দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই সুপ্ত মন সদা সক্রিয় ও সচেতন। শরীরের রক্তসঞ্চালন, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক, শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড ও মূত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া ইহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। স্বপ্নাগ্রস্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হইয়া নিদ্রার ঘোরেই শয্যা ত্যাগ করিয়া নানা স্থানে বিচরণ বা কিছু কার্য্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই করিয়া বসে। মাতাল উন্মত্ত অবস্থায় অকথ্য বাক্য উচ্চারণ, গুরুজনকে প্রহার প্রভৃতি মন্দ কার্য্য করিয়া

ফেলে। কিন্তু নেশা কাটিলে কৃত কর্ম দেখিয়া বা শুনিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, তৎসমুদয় তাহারই কর্ম। স্বপ্নাবস্থায় অনেকে অনেক জটিল সমাস্যার বা প্রশ্নের সমাধান করিয়া ফেলেন। এই সকল সুপ্ত মনের কার্য্য। এমিল কুয়ে তাঁহার "Self-Mastery Through Conscious Autosuggestion"নামক পুস্তকে এই বিষয়েরবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মনের এই গুপ্ত দেশে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দশ বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা আহৃত সকল প্রকার জ্ঞানই সঞ্চিত থাকে। কল্পনা বা চিন্তা এই মনের শক্তি। তদ্রূপ ইচ্ছাই জাগ্রত মনের শক্তি। মনের দ্বিবিধ স্তরের এই দ্বিবিধ শক্তির মধ্যে যখন বিরোধ বাধে, তখন কল্পনাই (imagination) জয়লাভ করে। ইচ্ছা স্বাধীন নহে, কল্পনার অধীন। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বিষয়টী পরিষ্কারভাবে বোঝা যাইতে পারে।

একটি কাঠের তক্তা যখন ভূমির উপর পড়িয়া থাকে তখন আমরা অনায়াসে উহার উপর দিয়া যাতায়াত করিতে পারি, মাটির উপর পড়িয়া যাই না। কিন্তু উহাকে যখন উচ্চে দুটি দেওয়াল বা থামের উপর রাখা হয় তখন আমরা উহার উপর দিয়া চলিতে খুব ভয় করি। শুধু তাহাই নহে; দুই এক পা চলিয়াই হয়ত আমরা ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিও পরে ভূমিতে লাফ দিয়া পড়ি। ইচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টা সত্বেও আমরা তখন স্থির থাকিতে পারি না। সেরূপ চোরা বালিতে পতিত মানুষ যতই উঠিতে চেষ্টা করে ততই সে বেশী বালির গর্ভে নিমজ্জিত হয়। এইরূপভীতি বা মস্তকঘূর্ণনের একমাত্র কারণ এই—আমরা মনে ভাবি যে, আমরা পড়িয়া যাইব, অন্য কিছু নহে। সূত্রধর ও রাজমিস্ত্রীগণ যে উহার উপর দিয়া নির্ভয়ে সহজে হাঁটিয়া যাইতে পারে তাহার একমাত্র কারণ, তাহারা ভাবে যে, তাহারা তদ্রূপ করিতে পারে। যে রাত্রিতে আপনার ঘুম না হয় সে রাত্রিতে আপনি বিছানায় পাশ ফিরাইতে ফিরাইতে নিজেকে ঘুম পাড়াইবার কতই না চেষ্টা করেন। কিন্তু যতই নিদ্রিত হইতে আপনি চেষ্টা করিবেন নিদ্রা ততই আপনাকে দূরে

ফেলিয়া দিবে। আবার ঘুমের কথা না ভাবিয়া অন্যমনস্ক হইলে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি ঘুমাইয়া পড়িবেন। কিম্বা মনে করুন, আপনি আপনার কোন বন্ধুর নাম ভুলিয়া গিয়াছেন। নামটি যতই স্মরণ করিতে চেষ্টা করুন না কেন, উহা কিছুতেই আপনার মনে আসিবে না। অন্য সময় যখন কোন কাজে ব্যাপৃত আছেন বা আপন মনে নীরব ও নিশ্চিত হইয়া বসিয়া আছেন তখন হয়ত হঠাৎ বিস্মৃত নামটি মনে উদিত হইবে। ছেলেমেয়েদের যখন কোন কারণে হাসি পায় তখন তাহারা হাসি চাপিয়ারাখিতে পারে না। চেষ্টার সংগে সংগেই তাহারা হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলে। যাহারা প্রথম বাইসাইকেল চড়িতে শেখে তাহারা সাইকেল চালাইতে চালাইতে যদি কোন গাড়ী, মানুষ বা জন্তুর সমীপবর্তী হয় তখন অন্য দিকে হ্যাণ্ডাল বাঁকাইলেও সম্মুখস্থ বস্তুর উপর পতিত হয়।

উপরোক্ত উদাহরণগুলি হইতে বুঝা যায়, ইচ্ছাশক্তির সহিত যখন ভাবনা বা কল্পনাশক্তির সংগ্রাম বাধিয়া যায় তখন ইচ্ছার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। চেষ্টা ইচ্ছাসম্ভূত, আবার ইচ্ছাশক্তি মাংস পেশীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কল্পনাকে স্নায়ুজাত বলিতেও পারা যায়। স্নায়ুমণ্ডলই মাংস পেশী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। মন যখন কোন চিন্তায় পূর্ণ থাকে তখন শত চেষ্টা করিলেও উহার গতি নিরোধ করা যায় না। তাহা মাংসপেশী, এমন কি, ইন্দ্রিয়সকলের নিষেধ সত্বেও ফল প্রসব করিবে। যাহা মানুষ ভাবে সে তাহাই হয়। ভাবনাই সমস্ত ফলের জননী। শাস্ত্রকার সত্যই বলিয়াছেন, মন সৃষ্টি করে এ শরীর। একাগ্র চিন্তার দ্বারা শারীরিক বিকারও উপস্থিত হয়। গভীর ভাবনার দ্বারা অংগপ্রত্যংগের বিকৃতি কোন কোন সাধুর জীবনেও দেখা গিয়াছে। চিন্তা এবং জড় বস্তু মূলতঃ একই হইলেও চিন্তা জড় অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। উহা সাধকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। সূক্ষ্ম বস্তুর শক্তি স্থূল বস্তুর শক্তি অপেক্ষা যে অনেক বেশী তাহা চিন্তাশীলব্যক্তি কোন না কোন সময় অনুভব করিয়াছেন। ফরাসী মনীষী প্যাস্কেল সত্যই বলিয়াছেন, প্রেমের

কথা ব'লিতে বলিতে আমরা প্রেমেই পতিত হই। এমিল কুয়ে তাহ বলিয়াছেন যে, ভাবনাই সর্ব সম্পদের প্রসূতি। সি আর ব্রুকস্ সাহেব তাঁহার Practice of Autosuggestion নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। চার্লস বুদোউইন (Charles Budouin) জেনেভার জিন জ্যাকস্ রুশো ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যাপক এবং এমিল কুয়ের একজন বিখ্যাত শিষ্য। তিনি কুয়ে প্রণালীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাঁহার Antosuggestion and suggestion নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুদোউইন তাঁহার "The power within us" এবং "The Inner Discipline" নামক পুস্তকদ্বয়ে কুয়ে প্রণালীকে এক যুক্তিগ্রাহ্য মনোবিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছেন। বেদান্তের বা হিন্দু যোগের সহিত এই মনোবিজ্ঞানের সাদৃশ্য কোথায় তাহা পরে আমরা আলোচনা করিব। হিন্দুমতে এইরূপ কোন প্রণালী আছে কিনা তাহার অনুসন্ধানও সুধীর পাঠককে দিবার আন্তরিক ইচ্ছা রহিল।

আমরা সুপ্ত মনের কত অধীন ইহা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝা আবশ্যক। কেহ অন্য কাহারো একটি কাপড় বা জামা স্পর্শ বা ব্যবহার করিবার সময় যদি তাহাকে বলা যায় যে, সে যাহার পরিহিত জিনিষ ব্যবহার করিতেছে তাহার খুব খোসপাঁচড়া হইয়াছে বা হইয়াছিল; ঘটনা সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক, অমনি সে নাক সিঁটকাইতে আরম্ভ করিবে। সে উক্ত কাপড় ফেলিয়া দিতে না দিতে গাত্রে চুলকানি অনুভব করিবে। অনেকে এইরূপে নানা রোগেও আক্রান্ত হইয়াছেন। শিশুদের মধ্যে সুপ্ত মন অধিকতর ক্রীয়াশীল বলিয়া উহারা পরোক্ষ সংকেতের কবলে অতি শীঘ্র পতিত হয়। শ্রীমতি কউফমান তাঁহার "Coue for Children" নামক পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন, শিশুগণ কত শীঘ্র বা কত সহজে রুগ্ন বা সুস্থ হয়। কুয়ের প্রণালী স্ত্রীলোক ও শিশুগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মেডিক্যাল কলেজের বা স্কুলের ছাত্রগণ রোগের লক্ষণগুলির বিষয় পড়িতে

পড়িতে বা ভাবিতে ভাবিতে এই লক্ষণগুলিতে অনেক সময় আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ভয়ে বা প্রেমে আমরা সুখ ও দুঃখের সংক্রমণ পাই। অনেকে ভয়েতে সুস্থ শরীর সত্ত্বেও কলেরা বা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। শুধু রোগ নহে; এইরূপ সুখ বা দুঃখও পরস্পরের মধ্যে সংক্রামিত হয়। আমেরিকার বিখ্যাত মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন, "মানুষ মনে করে, পাপ বা পুণ্য স্পষ্ট কার্য্য দ্বারাই প্রকাশ বা অপরে প্রদান করা যায়; কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যায় যে, পাপ-পুণ্য হইতে সর্বদা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইয়া তাহাদের অগোচরেই অন্যে সংক্রামিত হইতেছে।" Book of Proverbs এ (প্রবাদপুস্তকে) আছে যে, প্রফুল্ল হৃদয় অলক্ষিতে ঔষধের ন্যায় অপরের উপর ক্রিয়া করে; আর নিরানন্দ মন বিষের ন্যায় ভাব বা ভাষার অদৃশ্য ইংগিতে অপরের মনকে বিষাক্ত করে। শিশুর সরল হাসি দেখিলে, সুকণ্ঠ সংগীত শুনিলে, প্রস্ফুটিত গোলাপ বা অন্য ফুল আঘ্রাণ করিলে কাহার বিষন্ন মনে না আনন্দ আসে? কাহার মুখে না হাসি ফুটিয়া উঠে? পিতার রোগ পুত্রে যে সঞ্চারিত হয় বলিয়া আমরা জানি নব্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে উহা শারীরিক নহে, মানসিক। আজন্ম এই কথা শ্রবণেই শিশুর মনে উহার দৃঢ় ছাপ পড়িয়া যায়। যে সব পুস্তিকায় ও বিজ্ঞাপনে রোগের বিস্তৃত বিবরণ ও তাহার অমোঘ ঔষধের বিষয় প্রচার করা হয় তাহাদের দ্বারা কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই অধিকতর হয়। রুগ্ন ব্যক্তিগণ এই সব বিজ্ঞাপন পাঠে রোগের বিভীষিকায় নিজেকে বলিদান করে। সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি দ্বারাও এইরূপে সমাজের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হয়। পরচর্চা ও পরনিন্দা আমরা কয়েকজনে একত্রিত হইলেই নিত্য করিয়া থাকি; কিন্তু তাহাতে আমরা আমাদের কতদূর ক্ষতি করি তাহা একবারও চিন্তা করি না। যে দোষটা আমরা অপরের ভিতর দেখিতে থাকি তাহা অলক্ষিতে আমাদের মধ্যেই আসিয়া পড়ে। আবার যদি গুণগুলি অপরের মধ্যে লক্ষ্য করি সেই গুণগুলির অধিকারীও আমরা

অচিরে হইতে পারি। শিক্ষা দর্শনের মূলতত্ব এই যে, নেতিমূলক (negative)। প্রণালী অনিষ্টকর। ইতিমূলক (Positive) উপদেশই শ্রেষ্ঠ উপায়। এমিল কুয়ে তাই বলেন, যাহা হইতে চাও তাহার চিন্তায় মনকে সদা পূর্ণ রাখ। ভবিষ্যতে এই চিন্তাই আশানুরূপ ফল প্রসব করিবে। চিন্তাই কর্মের জনক। চিন্তাই আবার কর্মফলদাতা। মনের এমন শক্তি আছে যে, সে যাহা চায় তাহা লাভ করে। আমরা কি হইতে চাহি না, সেই বিষয়ে অধিক দৃষ্টিদান অবিবেচনার কার্য্য। জনৈক মহাপুরুষ বলিয়াছেন, ধর্মজীবনে অসৎ বা পাপের বিষয় বেশী ভাবিতে নাই। পুণ্যের বিষয়, সত্যের বিষয়, যতই ভাবা যায় ততই মন সৎচিন্তায় পূর্ণ থাকে ; আধ্যাত্মিক উন্নতি ততই দ্রুত হয়। ফ্রয়েডের সাইকোএনালিশিসের (মনোবিশেষণের) প্রণালীর সহিত এমিল কুয়ের এইখানেই প্রভেদ। ফ্রয়েডের মতে মানুষ নিজের দুর্বলতাগুলি যদি সর্বদা মনের সামনে রাখে তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত স্থানে রক্ষিত কর্পূরের মত এই সকল উড়িয়া যায়। এই নীতি সত্য হইবে তাহাদের কাছে যাহারা নিজেকে উন্নত করিতে ও সংশোধন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যাহাদের মনে দৃঢ়তা নাই, তাহাদের পক্ষে দুর্বলতা দূর করিবার উপায় কি ? ডক্টর জুং তাঁহার Modern Man in Search of a Soul নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে বলিতেছেন, তিনি প্রায় পৃথিবীর সর্বদেশাগত স্নায়ুরোগাক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করিয়া এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন যে, আদর্শহীন জীবনেই এই প্রকার মানসিক রোগের অধিক প্রকোপ। উক্ত রোগীসমূহ যখন জীবনে একটি আদর্শ লাভ করে তখন তাহাদের আত্মবিকাশের সংগে সংগেই অন্যান্য দুর্বলতা অপসৃত হয়।

শিশুমনের unconscious cerebration (অজ্ঞাত শিক্ষা) নামক একটি প্রক্রিয়া আছে। শিশু প্রকারান্তরেই সব শিক্ষা গ্রহণ করে। যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শিশু বাস করিবে তাহার মনের গঠন তদ্রূপই হইবে। তুমি এইরূপ করিও না, শিশুকে ইহা বলা বৃথা। কারণ, ঠিক

তৎক্ষণাৎ না হউক, অন্য সময় সে উহা করিয়া বসিবে। 'তুমি এইরূপ কর'—এরূপ বলিলে পূর্বাপেক্ষা অধিক উল্লাসে হয়ত সে তাহা পালন করিবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিশু-শিক্ষার প্রণালী এইরূপ—তাহাকে যা হইতে বা করিতে আপনারা চাহেন তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্তটি তাহার সম্মুখে রাখুন। শিশু আপনার আদেশ অপেক্ষা না করিয়াই তাহার অনুসরণ করিবে। শৈশবে সুপ্তমন অতিশয় ক্রীয়াশীল। তাই শিশু যাহাই দেখে তাহাই হইতে চায়। অসৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিলে শিশুকে যত সদুপদেশ দাও না কেন সে অসৎ হইবেই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যত ভাল হইবে শিশুর জীবনও তত ভাল হইবে। প্রাচীন ভারতে গৃহে গৃহে সেইরূপ আবহাওয়া ছিল বলিয়া গৃহের ছেলেমেয়েগুলির জীবন এত সুন্দর হইত। মন্দির ও বিদ্যালয়—এই উভয়ের শিক্ষাকার্য গৃহেই সম্পাদিত হওয়া উচিত। গৃহ শুধু শিক্ষালয় নহে, উহা ধর্মস্থানও বটে। ধর্ম ও শিক্ষা উভয়ই আরম্ভ হওয়া উচিত গৃহেই। প্রথম জীবনে তাহা না পাইলে পরবর্তী জীবনে শিশু বালক হইয়া যতই মন্দিরে বা বিদ্যালয়ে যাউক না কেন, সবই নিষ্ফল হয়।

শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমার জনৈক বন্ধু স্বীয় গৃহে নিত্য প্রাতে—দেবদেবীর পট ও প্রতীকের সম্মুখে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়া ধ্যান করিতেন। ধ্যানের সময় তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু স্বেচ্ছায় আসিয়া তাঁহার পাশে স্তিমিত নয়নে বসিতে শিখিল। একদিন কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে প্রাতে কোথাও য'ইতে হয়। তাই সেদিন তিনি ধ্যান করিতে পারেন নাই। পিতা আসিবামাত্রই শিশু ধরিয়া বসিল, তিনি আজ ঠাকুরের সামনে স্থিরভাবে বসেন নাই কেন? পিতা তখন লজ্জায় নির্বাক! শিশুই সেদিন তাঁহাকে একটি শিক্ষা দিল। কারণ, দেখিয়াই শিশু ধ্যানার্থে স্থিরাজ হইতে শিখিয়াছে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বোধ হয় এই অর্থেই বলিয়াছেন যে, শিশুই বৃদ্ধের পিতা। হ্যারিক্রশ বলিয়াছেন, "বয়স্ক মনুষ্যের মধ্যেও শিশু

বিদ্যমান।" সুপ্ত মনেই শিশু মন বাস করে। (The child still exists in the inmost nature of man)। তাই সুপ্ত মনকে শিশুর মতই শিক্ষা দিতে হইবে।

আমরা যে এত দুঃখকষ্ট ভোগ করি তাহার জন্য প্রধানতঃ আমরাই দায়ী। অবশ্য এই অপ্রিয় সত্য হয়ত অনেকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। চার্লস বুদোইন বলেন যে, আমরাই আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের জনক। সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করিলে বহু দুর্ভাগ্যের আক্রমণ হইতে মানুষ নিজেকে রক্ষা করিতে পারে। মিথ্যা বলা, চুরি করা ও দাঁতে নখ কাটা প্রভৃতি ছোট বড় অনেক কুঅভ্যাস অবহেলা নিমিত্ত জীবনে দৃঢ়মূল হইয়া যায়। এই সকলের একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের সুপ্ত মনকে আমরা সুশিক্ষা দিই নাই ; অথচ আমাদের জাগ্রত মনে অনেক নীতিবাক্য মুখস্থ আছে। বনজুর বলেন, আঁচিলগুলি মাত্র দুই মিনিট কাল মানসিক চিকিৎসার দ্বারা সারান যাইতে পারে। তিনি বলেন, শতকরা পঞ্চাশটি আঁচিল এইরূপে আরোগ্য করা গিয়াছে। আঁচিল সারান সামান্য ব্যাপার হইলেও উহার গভীর ভাবার্থ আছে। শুধু মনের ভাব পরিবর্তন দ্বারা শীতবোধ বৃদ্ধি বা হ্রাস করান সম্ভব। মানসিক চিকিৎসালয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ সুপ্ত মনে শিক্ষামূলক সংকেত বা ইঙ্গিত দ্বারা প্রসূতির মনকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রসব-বেদনা দূর করিয়াছেন। অসুখের ইতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রধান পন্থা অসুখের বিষয় একেবারে না ভাবা বা খুব কম ভাবা। জেনস্ সাহেব তাঁহার ম্যালেরিয়া (Malaria) নামক ইংরাজী পুস্তকে লিখিয়াছেন, প্রাচীন গ্রীকগণ তাঁহাদের অসুখের বিষয় এক-বারেই ভাবিতেন না। মন হইতে অসুখ বিতাড়িত করিতে পারিলেই উহা শরীর হইতে অচিরে আপনা আপনিই সরিয়া পড়িবে। মনই রোগ ও শোকের আবাস-ভূমি, শরীর নহে। মন উহাদের চিন্তা হইতে মুক্ত হইলেই উহারা শক্তিহীন হইয়া দূরে পলাইবে। স্বাস্থ্যই মনের স্বাভাবিক অবস্থা। মনে বিকার প্রবেশের সংগে সংগেই অস্বাস্থ্য উপলব্ধি হয়। শিশুর সুপ্ত মন সমধিক

জাগ্রত বলিয়া কুশিক্ষা ও সুশিক্ষা শিশুর নিকট সমানভাবে ফলপ্রদ। শীতকাল কিরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তরে শিশুকে যদি বলেন, শীতঋতুতে আমরা ঠাণ্ডায় খুব জড়সড় হইয়া থাকি, ও অনেক গরম কাপড় গায় দিতে হয় তাহা হইলে এই শিশুর জীবনের শীতবোধ অত্যধিক হইবে। সন্তরন, বেড়ান, ও দৌড়ান প্রভৃতি ব্যায়ামে ক্লান্তিবোধও অনেক সময় এইরূপ মনের খেলা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরের ক্লান্তিবোধ ইংগিত দ্বারা আমাদের মনে সংক্রামিত হয়। কোনও শিশুর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে আপনি যদি অবহেলাক্রমে বলিয়া ফেলেন যে, আপনি শ্রান্ত তখন শিশুও তদ্রূপ হইয়াছে বলিয়া বিশ্রামার্থ পিছনে পড়িয়া থাকিবে। ভারবোধ সম্বন্ধেও বহু ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রৌঢ় ভারবাহীর মস্তকস্থিত ঝুড়ি হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে সমস্ত দ্রব্য অপসারিত করিয়া লইলেও কিয়দ্দূর গমনান্তর সে ভারবোধে ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে বসিয়া পড়িবে। দুই তিন মাইল ভ্রমণকালে কোন কোন পথিকের কথায় আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, আমরা দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করিয়াছি তখনই আমরা শ্রমে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এমিল কুয়ে তাঁহার এক পুস্তকে শিশুর ব্যথাবোধের কথা লিখিয়াছেন। শিশুর হাতে যদি একটা আঁচড় লাগে বা তাহার আঙ্গুলে কাঁটা ফোটে, ব্যথা লাগুক আর নাই লাগুক শিশু কাঁদিতে আরম্ভ করে। তখন তাহার মাতা ছুটিয়া গিয়া তাহার আঙ্গুলের উপর ফুঁ দিতে দিতে বা হাতের ব্যাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে যখন বলে 'আর ব্যথা নেই' অমনি শিশু কান্না বন্ধ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করে। কারণ, শিশুর মন মাতৃবাক্যে খুব বিশ্বাসী। শিশু যখন মায়ের কথায় 'ব্যথা নাই'—এইরূপ কল্পনা করিল তাহার ব্যথাবোধও সংগে সংগে কমিয়া গেল। চার্লশ বুদোইন তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। উহা হইতে পাঠকপাঠিকা সুপ্ত মনের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইবেন। একটি বালক শিশুকাল হইতে কোলা ব্যাঙ দেখিয়া ভয় পাইত। মাতার

অনুকরণেই এই ভীতি তাহার মনে উৎপন্ন হইয়াছিল। মাতাও তাহার মাতার নিকট হইতে উহা পাইয়াছিল।

পুরুষপরম্পরায় ভীতির লক্ষণগুলি প্রবল হইয়া উঠিল। শিশুর ঠাকুরমা কোলা ব্যাঙ দর্শনে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হন। উক্ত বৃদ্ধা মৃত্যুর সময়ে প্রলাপ বকিতে বকিতে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, কোলা ব্যাঙগুলি তাঁহার বিছানার উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত এই ব্যাঙ ভীতি সুপ্ত মনকে শিক্ষিত করার সংগে সংগেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। এ্যাড্‌লার সাহেব তাঁহার "Understanding Human Nature" (মানব চরিত্রের অবগতি) নামক বিখ্যাত পুস্তকে বলেন, শিশুকালে মানুষ স্বীয় স্বভাবের যে আকার দান করে তাহা চির জীবন এক ভাবেই থাকিয়া যায়। স্বভাবের এই স্বরূপ পরিবর্তিত করা মানুষের প্রায় সাধ্যাতীত। শিশুর জীবনে যে বিষয়ের সামান্ত রেখা পড়ে, ভবিষ্যতে তাহা গভীর দাগে পরিণত হয়। জীবনের গতি বা বৃত্তি শৈশবেই নির্দিষ্ট হইয়া যায়। মানব মন যাহা পছন্দ করে তাহাই অজ্ঞাত সারে অনুকরণ করে। শিশুর মন এত অনুকরণ-প্রিয় যে, সে যাহা দেখে তাহাই ভবিষ্যতে করিতে বা হইতে চায়। খুল্লতাতের বা পিতার সৈনিকের পোষাক দেখিয়া শিশু হয়ত বিশ বৎসর পরে যৌবনে সৈনিক হইবার ইচ্ছা করে। দেশ বিদেশে ভ্রমণে যাইতে অনিচ্ছুক হইলে ট্রেণের সময় ভুল হইয়া যায়। যে বন্ধুর সহিত বিবাদ হইয়াছে তাহারই প্রদত্ত উপহার আমরা হারাইয়া ফেলি, যাহাকে আমরা পছন্দ করি না তাহার সহিত যে বন্ধুর কোন সংশ্রব আছে সেই বন্ধুর নামই আমাদের মনে থাকে না। যে বস্তুর পরিবর্তে আমরা অন্য কোন বস্তু পাইতে চাই সেই বস্তুই আমরা অসাবধানতায় ভাঙিয়া ফেলি। এই সমস্তই সুপ্ত মনের ক্রিয়া এবং কৌশল।

ফ্রয়েড সাহেবের মতে আকস্মিক দুর্ঘটনা, ক্ষিপ্রতা এবং ভ্রান্তিজনিত মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে অনিচ্ছাকৃত আত্মহত্যা। এই প্রকার মৃত্যুর কারণ সুপ্ত মনে অবস্থিত

কোন দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া মাত্র। বেলজিয়ামের বিখ্যাত কবি ভারহাইরেনের মৃত্যু উক্ত প্রকারেই ঘটিয়াছিল। আমিজেন্‌স্ ষ্টেশনে রেলগাড়ী চাপা পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অচেতন মনের গভীর প্রদেশে কি একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। তাই তাঁহার লেখার মধ্যে পুনঃ পুনঃ রেলগাড়ীর সৌন্দর্য ও বিভীষিকার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কল্পনার ছাপ তাহার ভ্রূণের উপর পতিত হয়। ডারউইন লিখিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় প্রতিবেশিনী একটি বালিকাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন বলিয়া তাহার নবজাত শিশুটি অবিকল উক্ত বালিকার মত আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছিল। লিবণ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, একটি বাগানের মালীর চেহারা তাহার গ্রাম্য গির্জাস্থ একটি সেণ্টের প্রস্তরমূর্তির মত হইয়াছিল। উক্ত মালির মাতা গর্ভাবস্থায় সেই সেণ্টের মূর্তিটি খুব পছন্দ করিতেন এবং এরূপ আকার-বিশিষ্ট একটি পুত্রের কামনা করিয়াছিলেন। তাই তাহার পুত্রের চেহারাও তদনুরূপ হইয়াছিল। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সুপ্ত মন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল বলিয়া উহার প্রভাব ভ্রূণের উপর অবিলম্বে পতিত হয়। এই জন্ত আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোককে সাবধানে রাখিবার প্রথা হিন্দু গৃহে প্রচলিত। জনৈক ডাক্তার-কথিত নিম্নোক্ত সত্য ঘটনা হইতে উপরোক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কোন যুবতীর দ্বিতীয় বার গর্ভাবস্থায় তাহার স্বামীর জনৈক বন্ধু দৈনিক তাহাদের বাড়ীতে আসিতেন। স্ত্রীলোকটি উক্ত ব্যক্তিকে পূর্বে কখনো দেখে নাই। এই ব্যক্তির বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গলি নষ্ট হইয়া এরূপ ভাবে স্থূল হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছিল যে, উহাকে একটি সিংহের থাবার ন্তায় ভীষণ দেখাইত। বিকৃতাকার নখটি দেখিয়া গর্ভিণীর এত ভয় হইয়াছিল যে, ঐ ব্যক্তি যখনই তাহাদের বাড়ীতে আসিত তখনই গর্ভিণীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। যুবতী ভয় পাইত, পাছে তাহার ভাবী শিশুটির নখ এইরূপ হইয়া পড়ে। শেষে তাহার স্বামীকে এই ভয়ের কথা বলায় তিনি তাহার বন্ধুকে তাহার গৃহে আসিবার কালে উক্ত হস্তে দস্তানা

পরিয়া আসিতে বলেন। কিন্তু হায়! যুবতীর ভয়ের দাগ ইতিমধ্যেই তাহার ভ্রূণের উপর পড়িয়াছিল। যখন শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইল তখন দেখা গেল, শিশুর বাম হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি উক্ত ব্যক্তির ন্যায় বিকটাকার হইয়াছে। এইরূপে ভয়, কুসংস্কার ও ঘৃণা প্রভৃতির প্রভাবে সুপ্ত মনে ভীষণ বিকার উপস্থিত হয়। এই মানসিক বিকারের প্রতিক্রিয়া মানব সমস্ত জীবন ধরিয়া অনর্থক ভোগ করে। সুপ্তমন সুশিক্ষিত হইলে মানুষের অধিকাংশ দুঃখকষ্ট কমিয়া যাইবে ও মানব স্থায়ী শান্তি ও সুখের সন্ধানপাইবে।

রাশিয়ার ঋষি টলষ্টয় তাঁহার শেষ বয়সে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, '৭' সংখ্যাটি তাঁহার নিকট ভীতিপ্রদ ছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ নভেম্বর তাঁহার বৎসরের দৈনন্দিন 'লিপি' নামক ইংরাজী পুস্তকে তিনি মৃত্যুর সম্বন্ধে অনেকগুলি চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কয়েক দিনের সামান্য অসুখের পর তিনি ৭ই নভেম্বর মারা যান। যদিও তাঁহার অবস্থা অসুখের জন্য খুব খারাপ হয় নাই তথাপি তিনি উক্ত দিবসেই মারা যান। আর একটি সত্য ঘটনার কথা লিখিতেছি। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাহাকে বলা হয় যে, কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য তাহার মৃত্যু হইবে। তাহার প্রত্যেক অংগে একটি সাধারণ সূচ ফুটান হইল এবং তাহার ঘরের মধ্যে যে জলের কল ছিল তাহার ট্যাপটিও খুলিয়া দেওয়া হইল এবং কল হইতে তীব্র বেগে জল পড়িতে লাগিল। উক্ত লোকটিকে বলা হইল যে, তাহার শরীরের বিভিন্ন আহত স্থান হইতে রক্তের স্রোত বহিতেছে। ইহা বিশ্বাস করিয়া সে প্রাণত্যাগ করিল।

পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে মনে সৎ, শুভ, সবল চিন্তারাশি সর্বদা জাগ্রত রাখা উচিত। নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রত মনের বন্ধন শিথিল হইয়া যাওয়ায় সুপ্ত মন অধিক ক্রিয়াশীল হয়। নিদ্রার পূর্বে মনে যদি আমরা সেইরূপ সঙ্কেত দিয়া রাখি তবে পরদিন প্রাতে অভিপ্রেত সময়েই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। অনেকেই নিজ জীবনে উহা পরীক্ষা করিয়াছেন। যে বালক

কোন দিন আট ঘটিকার পূর্ব্ব নিদ্রা ত্যাগ করিতে পারে না তাহাকে যদি পরদিন প্রাতে কোন প্রমোদ জনক ভ্রমণ বা অন্য কোন নূতন খেলার কথা বলা হয়, সে হয়ত প্রাতে পাঁচটার সময় উঠিয়া বিছানায় বসিয়া থাকিবে। আনন্দের উৎফুল্লতা তাহার দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাসের ব্যতিক্রম করিবে। বজ্র-নির্ঘোষ বা প্রবল ঝড়ে যে নারীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় না তিনি স্বীয় শিশুর সামান্য ক্রন্দনেই জাগ্রত হন। নিদ্রার পূর্বে যে সমস্যার সমাধান হয় না সুনিদ্রার পরে তাহা অতি সহজেই সম্ভব হয়। স্বপ্নের মধ্যে অনেকে অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর পান। কবি তাঁহার কবিতায় যে লাইনটি বহু চেষ্টা করিয়াও রচনা করিতে পারেন না, প্রাতে শয্যাত্যাগের পর তাহা অনায়াসে তাঁহার মনে উদিত হয়। সুষুপ্তিতে জাগ্রতাবস্থায় অন্যমনস্কতা এবং দেহ-জ্ঞান থাকে না বলিয়া সুপ্ত মনে সমস্ত শক্তি নিদ্রার পূর্বের চিন্তাটিতে কেন্দ্রীভূত হয়। সেইজন্য সুপ্ত মনে সমস্ত শক্তি নিদ্রার পূর্বেই চিন্তাটিতে কেন্দ্রীভূত হয়। সেইজন্য সুপ্ত মনকে সুশিক্ষিত করিতে হইলে নিদ্রার পূর্বে তাহাতে একটি ভাব বা চিন্তা প্রদান করা আবশ্যক। হোমার বলেন, নিদ্রাকালে মানুষের অংগপ্রত্যংগগুলি পরস্পর হইতে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ফরাসী দার্শনিক বার্গশোর মতে নিদ্রাকালে জাগতিক বিষয়ে অনুরাগ এবং দৈহিক বা পৈশিক ক্রিয়া স্থগিত থাকে বলিয়া সুষুপ্তিকে সাধনায় পরিণত করা অতি সহজ।

প্রত্যহ আমাদের অন্ততঃ দুইবার (প্রাতে ও সন্ধ্যায়) শারীরিক ও মানসিক শৈথিল্য (relaxation) অভ্যাস করা উচিত। আধুনিক জীবনে স্নায়ু ও পেশীর পরিচালনা এত অধিক হয় যে, মানুষের প্রকৃত বিশ্রাম, এমন কি নিদ্রাকালেও, অতি অল্পই হয়। এই জন্য পৈশিক শিথিলতা আমাদের অভ্যাস করা, অন্ততঃ স্বাস্থ্যের জন্য, অতিশয় আবশ্যক। নিদ্রাকালেও আমাদের মন দুশ্চিন্তা ও অত্যধিক ক্লান্তির জন্য পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না। এইজন্য যাহারা জাগ্রতাবস্থায় মানসিক ও পৈশিক শিথিলতা অভ্যাস না করেন তাহাদের প্রকৃত বিশ্রাম লাভ হয় না। খেলাধুলায়

যাহারা বিশ্রাম করিতে চান তাঁহারা যদি পৈশিক শিথিলতা অভ্যাস করেন, তবে তাহারা অধিকতর বিশ্রাম লাভ করিবেন। প্রাকৃতিক নীরবতার মধ্যে মানসিক বিশ্রাম লাভ করা সহজ। আমেরিকার বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক উইলিয়ম জেমস্ ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক প্রভৃতি মস্তিষ্ক-পরিচালনকারী ব্যক্তিগণকে এইরূপ শৈথিল্য অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিযাছেন। যাহাকে আমরা মনের একাগ্রতা বলি তাহা হইতে চেষ্টা (efforts) বিযুক্ত হইলে প্রকৃত relaxation (বিশ্রাম) হয়। পল এমিল নেভি বলেন, নিদ্রার পূর্বে ও পরে যে তন্দ্রার ভাব থাকে তখনই নূতন চিন্তা উৎপন্ন ও পরিপক্ক হয়। কিন্তু, আমাদের স্নায়ুগুলি এত অধিক পরিশ্রান্ত থাকে যে, প্রকৃতি স্নায়বিক শিথিলতা অনেকের পক্ষে অসম্ভব। কোলাহল ও নীরবতা যখন সন্ধ্যায় বা সকালে ক্রমান্বয়ে আমরা শুনি তখনও স্নায়ুর শ্রান্তি দূর হয়। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ, রাত্রি দ্বিপ্রহরে পাখীর ডাক, বাঁশির ধ্বনি বা অন্যান্য যন্ত্র-সংগীতে স্নায়ুর বিশ্রাম লাভ হয়। সামান্য অভ্যাসের ফলে শব্দপূর্ণ স্থানে এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমরা উক্ত প্রকার মানসিক স্থৈর্য্যলাভে সমর্থ হই। মানুষ যখন কোন একটি চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়ে তখন তাহার নিকট বাহ্য জগৎ অন্তর্হিত হয়। এই অবস্থাতে গ্রীসের আর্কিমিডিশ তাঁহার স্নানাগারে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি উহাতে এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তিনি নগ্নাবস্থায় লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। একবার এ্যাম্পিয়ার সাহেব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এতদূর বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়াছিলেন যে, তিনি এক খণ্ড চক্ হস্তে লইয়া ঘোড়ার গাড়ীর পিছনে ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার সমাধানগুলি তদুপরি লিখিতেছিলেন। তিনি চলন্ত ব্ল্যাক বোর্ডটিকে ঘোড়ার গাড়ী বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

নিদ্রার পূর্বে ও পরে বিশ বার আমাদের এই মন্ত্রটি (Formula) জপ করা উচিত—'প্রত্যহ সর্বপ্রকারে আমি আরও ভাল হই য়াছি'' (Every

day in every way I am getting better and better.) ইহা এমিল কুয়ের উপদেশ।

দ্বিপ্রহরে বা অন্য সময় যখন আমরা আরাম চেয়ারে বা বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করি বা একাকী নির্জন পথে বিচরণ করি তখন যদি আমরা এই ফরমূলাটি আওড়াই তাহা হইলে আমরা শরীর ও মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইব। ইহা দ্বারা শুধু যে আমরা স্বাস্থ্যলাভ করিব তাহা নহে, মানসিক সাম্য ও স্থৈর্য্য লাভের সংগে সংগে জীবনের প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত হইবে ও জীবন নদীতে অনুকূল স্রোত বহিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু মানুষের মন এত জটিলতা-প্রিয় যে, সহজ সরল কোন কিছুতে উহা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। বস্তুতঃ জগতে সত্য ও স্বাস্থ্য লাভের পথ অতীব সুগম এবং স্বাস্থ্যই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। উহার বিপরীত কিছু হইলেই বুঝিতে হইবে যে, আমরা প্রকৃতির ইংগিত অগ্রাহ্য করিয়াছি। বিশ্রাম অভ্যাস করিবার সময় আমাদের একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, আমরা যেন ইচ্ছাশক্তি আদৌ প্রয়োগ না করি। সুপ্ত মন দীর্ঘ কাল শিক্ষার ফলে যখন স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জ্জন করিবে তখন শরীরের উপর উহার প্রভাব অপরিসীম হইবে। নাসিকা বা অন্য স্থান হইতে রক্ত নির্গমন, সর্দি বা কাশি মনের ইংগিতেই আরোগ্য করা সম্ভব হয়। সময় মত একটি ফোঁড়া পাকান বা কোন একটি ক্ষত শুকান বিনা ঔষধে বা বিনা অস্ত্রোপচারেই সম্ভব হইবে। অনেক দুরারোগ্য অসুখ এই প্রকারে সারিয়া গিয়াছে। বহুমুখী মনকে একমুখী করিবার উহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ওয়ারশ সাইকোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ল্যাবোরেটারীর অধ্যক্ষ অধ্যাপক এব্রামস্কি অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তিনি যত বেশী ক্ষণ মনকে চিন্তাশূন্য করিতে পারেন তাঁহার মানসিক শক্তির বিকাশ তত বেশী হয়। প্রকৃত প্রয়াসের অর্থ উক্ত প্রকারে মনকে অন্য

চিন্তা হইতে বিমুক্ত করিয়া একটি চিন্তায় ডুবাইয়া দেওয়া। হার্বার্ট, পার্কিন, চার্লস বুদোইন, এমিল কুয়ে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎগণ বলেন যে, আমাদের বিদ্যালয়গুলির বালকগণকে এই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহাদের মধ্যে শিক্ষার উক্ত প্রণালী প্রথম স্থান অধিকার করিলে শিক্ষা সুফল প্রসব করিবে। শিশুর মনে গ্রহণ করিবার শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী। সেই হেতু তাহাদিগকেই সুপ্ত মনের শিক্ষাপ্রণালী শিখান উচিত। শিশুর স্নায়ুমণ্ডলী নমনীয় থাকে বলিয়া উহাদের স্নায়ুসংযম সহজসাধ্য। স্নায়ু শক্ত ও দৃঢ় হইলে উহা সংযত করা কষ্ট-সাধ্য। শিশুদিগকে রোগী দেখান উচিত নয় এবং অসুখ ও অশান্তির কথা তাহাদের সম্মুখে আলোচনা করাও অসমীচীন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শিশুগণ জন্ম হইতে পিতামাতা বা গৃহের অন্যান্য গুরুজনের নিকট রোগ, দুঃখ ও কষ্টের কথা এত বেশী শুনিতে পায় বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয় যে, এই সকলই বোধ হয় জীবনের চির সহচর।

শিশুর মনে এই কুসংস্কারগুলি সমূলে উৎপাটিত করা উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য সচ্চিন্তা রাশি ও সুসংস্কারসমূহ মনোক্ষেত্রে রোপন করা। জীবনে শ্রেষ্ঠ প্রগতি উহা হইতেই হয়। ফ্রোবেল বলেন, শিশুদের অসদ্ব্যবহার ও অন্যায় কার্যের জন্য তাহারা অপেক্ষা আমরা অধিকতর দায়ী। ডাঃ মেরিয়া মন্টেসারির মতে, শিশুর আসল স্বভাব সৎমুখী। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, মানব জীবন সংমূল, সৎপ্রতিষ্ঠ, সদায়তন। কাজেই মনকে সৎ হইবার ইচ্ছাভিমুখী করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকের আচরণ যত সৎ হইবে শিশুর উন্নতি তত দ্রুত হইবে। উন্নতির পথে যত বাধা বিপত্তি আছে তাহা দূর করিতে হইলে কুয়ের প্রণালী অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। গিয়ান বলেন শিশু যখন অন্যায় আচরণ করে তখন তাহাকে "কি মিথ্যাবাদী! কি লোভী তুমি?" এরূপ ভর্ৎসনা করা উচিত নয়। কারণ

এরূপ ভৎর্সনায় নিজেকে মিথ্যাবাদী ও লোভী মনে করিয়া সে তদ্রূপ আচরণ করিবে। কুবাক্যের এইরূপ বিষময় ফল! অবশ্য অসৎ বাক্য ব্যবহার বা অসৎ দৃশ্য হইতে কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমিল কুয়ের প্রণালীতে যদি আমরা সুপ্ত মতকে সুশিক্ষিত করিতে অভ্যাস করি তাহা হইলে অসৎ প্রভাব মনের উপর আর কার্যকারী হইবে না।

কথাসার—

"মানুষ মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনেতেই জ্ঞানী মনেতেই অজ্ঞান। কাপড়ের মত মনকে যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। লালে ছোপাও লাল নীলে ছোপাও নীল।...সাপে কামড়ালে বিষ নাই" জোর করে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়। আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমার আবার বন্ধন কি? তবেই হল, মন নিয়ে কথা।"

"আসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করা ভাল। আসন অভ্যাস করলে হজম শক্তি বা'ড়ে ও ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তা করে। মন স্থির কর। মন যদি আপনি স্থির হয়, তবে প্রাণায়া'মের আর কি দরকার।"

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত একটি পুস্তক সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের অভিমত

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত

(ক) এই পুস্তক সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র "দৈনিক বসুমতী" ১৫ই ভাদ্র ১৩৫৯ (৩১ শে আগষ্ট' ৫২) রবিবার লিখিয়াছেন—

"স্বামী জগদীশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত লেখক। বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন এবং সেগুলি নিঃসন্দেহে আমাদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনের মনকে উন্নত করেছে ? বর্তমান গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হলেও গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ যে কেবল মাত্র ভারতীয় অধ্যাত্ম বিষয়েই আমাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করেছেন তা নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও কতটা প্রভাব বিস্তারপূর্বক নবযুগের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক সূক্ষ্ম বিচারশীল মন নিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'স্বামিজীর উক্তি-চয়ন" ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত কয়েকখানি গান বিশেষ উপভোগের কারণ হয়েছে।"

(খ) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক "যুগান্তর" ৫ই আশ্বিন ১৩৫৯ (২১ শে সেপ্টেম্বর ১৯৫২) রবিবার লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থকার স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক এবং গীতা, চণ্ডী উপনিষদ, ও যোগ ইত্যাদি বিষয়ক অনেক গুলি বই লিখিয়া ইতিমধ্যে, যশস্বী হইয়াছেন। আলোচ্য বইখানিতে তাঁহার কয়েকটি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে এইসব নিবন্ধের আলোচনা বিশেষ ভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তৎসঙ্গে ভারতের ধর্ম ও আদর্শ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অবতারণাসমূহও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে. প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তক খানি ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী মাত্রেরই আদর লাভ করিবে।"

(গ) এই পুস্তক সম্বন্ধে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা" ১২ই আশ্বিন ১৩৫৯ (২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫২) রবিবার লিখিয়াছেন—

"ইহা স্বামীজীর জীবনী নহে। ইহাতে জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে তাঁহার বাণীর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব, স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রীতি এবং বর্তমান ভারতের আদর্শ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রভাব ইহাতে বর্ণিত। এনি বেশান্ত, ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিষ্টিন প্রভৃতি স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট চতুষ্টয় পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গী এবং ঋষি, কমরেড ও অতিমানবের তুলনামূলক আলোচনায় ঋষি আদর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই পরিশিষ্টট পড়িবার জন্য আমরা বাংলার তরুণ-তরুণীদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। তৃতীয় পরিশিষ্টে স্বামিজীর কয়েকটি সারগর্ভ উক্তি সংগৃহীত। স্বমিজীর জীবনী ও বাণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় যাহারা চাহেন তাহাদের পক্ষে এই বই বিশেষ উপযোগী হইবে।"

———